রবীন্দ্রনাথের
ছেলেবেলার গল্প



নন্দলাল ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প

নন্দলাল ভট্টাচার্য

লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
ডি. চক্রবর্তী
৩০।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, ১৩৯৫

পাণ্ডুলিপিসত্ত্ব ঃ
করবী ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ঃ
শ্যামদুলাল কুণ্ডু

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রক ঃ
গৌর মান্না
দেবাশিস প্রেস
৯।৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

হিমিয়া
পৃথিবরাজ
শিবাজী
বুড়িয়া
রাষ্ট্র-কে

॥ ১ ॥

পুলিশম্যান! পুলিশম্যান।

আচমকা চিৎকারটা শুনেই ছোট্ট রবি খেলা ফেলে ছোটে অন্দরমহলের দিকে। মা সারদা দেবী তখন ব্যস্ত ছিলেন কি যেন একটা কাজে। রবি হাঁফাতে হাঁফাতে একরকম তাঁর কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ছেলেকে অমনভাবে আসতে দেখে একটু উদ্বেগের সঙ্গেই মা বলেন, কিরে? কি হয়েছে।

পুলিশম্যান!

রবির গলা ভয়ে তখনও কাঁপছে। আওয়াজটাও কেমন যেন ক্ষীণ।

মা বলেন, কই, কোথায় পুলিশম্যান?

ওই যে, সত্য বলল।

মা যা বোঝার বুঝলেন। তাই রবিকে কোল থেকে নামিয়ে বলেন, তাহলে বোস এখানে। তারপর যে কাজ করছিলেন তাতেই হাত লাগান আবার।

রবি ঘরের এককোণে বসে মা-র কাজ দেখে আর ভাবে, কই মা তো পুলিশম্যান শুনে ভয় পেল না। অথচ তার বুকটা এখনও কেমন যেন ঢিপঢিপ করছে।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাইরের বারান্দায় এতক্ষণ খেলছিল রবি আর তার চেয়ে বয়সে দু বছরের বড় তার ভাগ্নে সত্য-প্রসাদের সঙ্গে। খেলতে খেলতেই সত্যপ্রসাদ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, পুলিশম্যান! পুলিশম্যান বলে। কথাটার মধ্যে যে ভয়ের কি আছে তা সত্যও জানে না। নেহাতই খেয়ালের বশে সে বলেছিল

কথাটা। রবি কিন্তু জানত, যদি কোন অপরাধীকে পুলিশ একবার ধরে তবে তাকে থানার অতল অন্ধকারে চিরকালের মত আটকে রাখাই তার কাজ। তাই ভয়ে কাঁপতে থাকে সে। রবি ভয় পেয়েছে দেখেই সত্যও মজা পেয়ে যায়—সে চেঁচাতেই থাকে—পুলিশম্যান! পুলিশম্যান—পুলিশম্যান—

আর রবি বাইরের সেই বারান্দা থেকেই সোজা ছুট লাগায় অন্দরমহলের দিকে। ভয়ে সে পেছন ফিরেও তাকায় না—মনে হয়, কি জানি পেছন ফিরলেই দেখবে তার পেছনে ছুটছে পুলিশ-ম্যান। খপ্ করে ধরে ফেলবে তাকে।

মা-র কাছে এসে পুরো না হলেও কিছুটা স্বস্তি পায় রবি। মা-র কথামত বসেও থাকে ঘরে। খানিকক্ষণ বসে থেকেই রবি কিন্তু কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই তাক থেকে পেড়ে আনে রামায়ণটা। এই রামায়ণটাই রবির দিদিমা অর্থাৎ মা-র সম্পর্কিত খুড়িমা রোজ সুর করে পড়ে শোনায় মাকে। রবিও তখন পড়তে শিখেছে—তাই রামায়ণটা খুলে পড়তে থাকে।

সেদিন কি জানি কি হয়েছে রবির। জমাটি খেলাটা তার মাঝপথেই ভেঙে গেল সত্যর ওই 'পুলিশম্যান', 'পুলিশম্যান' শুনে। রামায়ণ পড়তে বসেও যে সে খোলে সীতার করুণ বিলাপের জায়গাটাই। সীতার সেই কান্না আর বিলাপ পড়তে পড়তে কখন যেন রবিরও দুচোখ বেয়ে ঝরতে থাকে জল। সীতার দুঃখে একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েই কাঁদতে থাকে রবি।

রবির দিদিমা সেই সময়েই ঘরে ঢোকেন। রামায়ণ হাতে নিয়ে রবিকে কাঁদতে দেখে তিনি এগিয়ে আসেন। কোন জায়গাটা পড়ছে তা দেখে তিনি আর কোন কথা না বলে তার হাত থেকে রামায়ণটা নিয়ে আবার সোজা তা তুলে রাখলেন কুলুঙ্গিতে।

বেচারা রবি কি আর করে—সেখানেই বসে থাকে চুপচাপ।

অবশ্য এমনিও চুপচাপ বসে থাকতেই রবি ভালবাসে বেশি। ডাগর ডাগর চোখের দৃষ্টিটাকে দূর আকাশে পাঠিয়ে দিয়ে সে

কেবল ভেবেই যায়। তার ভাবনার আর শেষ নেই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তখন এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। রবির নিজের ভাইবোনেরা তো আছেই, তাছাড়া আছে প্রায় তার সমবয়সী ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্না ভাগ্নী এবং আরো নানা আশ্রিতের দল। তারা সবাই যখন হইচই করে খেলায় মাতে তখনও রবি তেমন ঠিকমত তাদের সঙ্গে খেলতে পারে না। খেলতে খেলতে উদাস হয়ে যায়—ফলে হার—আর দুয়ো দেয় খেলুড়েরা। তাই বোধহয় রবি একা একা থাকতে চায়।

এই রবিই হলেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড় হয়ে যিনি হাজার হাজার কবিতা লিখেছিলেন—ভাবনায়, কল্পনায়, যাঁর মনের তল পাওয়া ভার—তিনি বোধহয় সেই ছোটবেলা থেকেই হারিয়ে যেতেন তাঁর ভাবনার জগতে। আর তাই সবার সঙ্গে না খেলে খেলতেন একা একা, কিংবা মনের মত দুএকজনের সঙ্গে।

রবির মনের মত সাথীদের মধ্যে ছিল তার চেয়ে এক বছরের ছোট ভাগ্নী ইরাবতী—ইরু বলে যাকে ডাকত সবাই। ইরু হলো সত্যর বোন। স্বভাবে ইরুও বড় অদ্ভুত। প্রায়ই সে রবিকে বলত, আজও সেখানে গিয়েছিলাম।

কোথায়?

রাজার বাড়ি।

রাজার বাড়ি?

হ্যাঁ। গেলাম—কত কি দেখলাম। কত কথা হলো সেখানে।

রবি হাঁ করে শোনে ইরুর কথা। যত শোনে ততই অবাক হয়ে যায় সে। আর তাকে অবাক করতেই ইরু বলে যায় রাজবাড়িতে কি সে করল, কেমন খেলা হলো ইত্যাদি।

সে রাজার বাড়িটা যে কোথায় তা খুঁজে পায় না রবি। ইরু যেভাবে হঠাৎ হঠাৎ করে রাজবাড়িতে খেলার গল্প বলে তাতে এইটুকু সে বুঝেছে—রাজার বাড়ি যেখানেই হোক, তাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। দূরে যদি হতো তাহলে মেয়েটি অমন

হুটপাট করে যেতে পারত না রাজবাড়ি। তাই একসময় সে জিজ্ঞেস করে—হ্যারে, রাজার বাড়ি কি অনেক দূরে? সে কি আমাদের বাড়ির বাইরে? মেয়েটি বলে, না না, বাইরে কেন হবে, সে রাজার বাড়ি রয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।

তাহলে সেটা কোথায়? দোতলায়? একতলায় অথবা কোন ঘরের মধ্যে?

অবাক রবি ভাবে, এই বাড়ির সব ঘরই তো দেখেছি, কই কোন ঘরে তো রাজার বাড়ি দেখিনি? তবে কোথায়—কোথায় সে বাড়ি? ভাবনায় তোলপাড় রবি খুঁজে পায় না তার সঙ্গিনীর সেই রাজার বাড়ি। কিন্তু খোঁজায় তার বিরাম নেই এতটুকু। বড় হয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ 'রাজার বাড়ি' নামে এক কবিতা লিখে বলেছেন—

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো
সেই বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেতো।

এই রাজার বাড়ি খুঁজতেই রবি চলে আসত তার বাবার ঘরে। রবির বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বছরের প্রায় সারাটা সময়ই কাটাতেন বাইরে। দেশ বেড়ানো ছিল তাঁর নেশা। দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যও তাঁকে যেতে হত নানা জায়গায়। তাই তিনি যখন থাকতেন না তখন তেতলায় তাঁর ঘরটা থাকত বন্ধ। এই বন্ধ ঘরটার প্রতি রবির ছিল বিরাট আকর্ষণ। সেই রাজার বাড়ি খুঁজতে কিংবা নির্জন জায়গা খুঁজতেই রবি চলে আসত এখানে।

দুপুর বেলায় রবি থাকত যাদের জিম্মায়—তারা যখন ঘুমে অচেতন সেই সময়ই রবি চুপিচুপি চলে আসত তেতলায়। শুরু হত তার দুপুর বেলার নানা ভয়ংকর সব অভিযান।

তেতলায় উঠে রবি তার বাবার ঘরের খড়খড়ি খুলে হাত গলিয়ে ছিটকিনি টেনে দরজাটা খুলে ঢুকে যেত ঘরে। তারপর এক স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর রবি। সে রাজ্যে শুরু হত তার

নিজের মত চলা—নিজের মত বলা। একা একাই সে বলে যেত কত কি কথা।

ঘরের দক্ষিণ দিকে ছিল একটা সোফা। এই সোফাটা ছিল রবির দারুণ পছন্দের জায়গা। সেই সোফায় চুপ করে বসে কিংবা শুয়ে কেটে যেত রবির দুপুর। চারিদিকে কোন আওয়াজ নেই। সামনের ফাঁকা ছাদটায় খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর। সোফায় বসে সেই রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রবি ভেবে চলেছে তখন নিজের মনেই।

আবার কখনও বা, কখন কেন, প্রায় রোজই রবি তেতলার ওই ঘরেই তার বাবার যে স্নানের জায়গাটা ছিল—চলে যেত সেখানে। কলকাতায় তখন সবে এসেছে জলের কল। তেতলাতে মহর্ষির স্নানের ঘরেও ছিল কল। আর কল খুলে দিলেই ঝাঁঝরি দিয়ে ঝিরঝির করে ঝরত জল বৃষ্টিধারার মত। অসময়ে—অপ্রয়োজনে রবি দাঁড়িয়ে পড়ত সেই ঝাঁঝরির তলায়। তারপর সময়ের কোন হিসেব না মেনেই চলত তার স্নান। সে স্নানের আসল আনন্দটা হলো স্বাধীনতার। কেউ বারণ করার নেই—আবার করতেই হবে এমন বলারও কেউ নেই সেখানে। তাই অবাধ সে জলের ধারায় নিজের প্রাণের খেয়ালখুশিতে চলত রবির স্নান। মনের মধ্যে চলত তার নানা রঙিন ছবির আঁকাবুকি।

ছোট্ট রবির কাছে তার বাবার ঘরে এইভাবে লুকিয়ে আসাটা যেমন ছিল আনন্দের এক রোমাঞ্চকর অভিযান—তেমনি আরেক ভয়ঙ্করের অভিযান চলত এক পাল্কির ভেতরে।

খাজাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে পড়ে থাকত পাল্কিটা। বিরাট সেই পুরনো পাল্কিটার তখন নাম উঠেছে বাতিলের খাতায়। কিন্তু রবির ঠাকুমাদের আমলে সেই পাল্কির ছিল আলাদা আদর—আলাদা কদর। পাল্কিখানা বিরাট। আট আটজন করে বেহারা যাতে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য বিরাট লম্বা ছিল তার ডাণ্ডা দুটো। নবাবি ছাঁদের সেই পাল্কির গায়ে ছিল নানা

রঙিন আঁকজোক। মধ্যে ছিল মখমলে মোড়া নারকেল ছোবড়ার গদি।

কিন্তু তখন সে পাল্কির পড়ন্ত বেলা। ঠাকুর্দা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈভবের দিন তখন গত। দেবেন্দ্রনাথ বাবার করে যাওয়া ধারদেনার টাকা মিটিয়ে তখন সবে একটু থিতু হতে চলেছেন। তাই পাল্কি, বেহারা রাখাটা তখন তাঁর কাছে চরম বিলাসিতা। একারণেই বেহারাদের হয়ে গেছে ছুটি। আর ব্যবহার না হতে হতে একসময় সে পাল্কির রঙ গেছে চটে—গদির ছোবড়া এসেছে বেরিয়ে—পাল্কিটাই পড়ে আছে বাতিল আসবাবের ভিড়ে।

ভর দুপুর বেলায় পাহারাদাররা যখন গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে—সেই সময় রবি এসে ঢুকত ওই পাল্কির মধ্যে। টেনে বন্ধ করে দিত পাল্কির দরজা। তারপর প্রায় আলোহীন হাওয়াহীন ওই পাল্কির মধ্যে বসে রবি ছুটিয়ে দিত কল্পনার ঘোড়াটাকে। তার কল্পনায় চলতে শুরু করত পাল্কিটাও। শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় গিয়ে কল্পনার বেহারারা নামাত পাল্কি—সেদেশ ইতিহাস বা ভূগোলে আছে কিনা তা জানা নেই কারো। কিন্তু রবির তখন সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন দায় নেই। তাই তার পাল্কি নামত হয়ত কোন নেই রাজ্যে। কখনো পাল্কিটা গিয়ে নামত গভীর বনের মধ্যে। সেখানে জ্বলজ্বল করছে বাঘের চোখ। এই বুঝি হালুম করে ঝাঁপ দেবে সে। কিন্তু রবির কল্পনার সেই বনে—ওই পাল্কিতে তার সঙ্গী হয়ে এসেছে বিশ্বনাথ শিকারী। তাই ঠিক যে সময়ে থাবা বাগিয়ে বাঘটা দেবে ঝাঁপ—অমনি বিশ্বনাথ শিকারীর বন্দুক থেকে গুলি ছুটল—গুম গুম। ব্যস, বাঘ খতম। পাল্কিও আবার ছুটছে বেহারাদের কাঁধে—হুমহুনা গানের সুরে।

একভাবে তো পাল্কি ছুটতে পারে না—তাই পাল্কি হয়ে যায় ময়ূরপঙ্খী নৌকো। জঙ্গল ছেড়ে গহীন নদীতে তরতর করে

এগিয়ে চলল সে নৌকো। এমন সময় উঠল ঝড়। চারিদিকে উঠল সামাল সামাল রব। রবি কিন্তু নির্ভয়। ভয় থাকবে কেন? তার নৌকার হাল ধরে বসে আছে যে স্বয়ং আবদুল মাঝি।

অনেক অনেক পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলতে গিয়ে আবদুল মাঝিরও একটা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন শুধু কথা দিয়ে। তিনি লিখেছেন, 'আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম।'

এই আবদুল মাঝি যেসব গল্প করত ছোট্ট রবির সঙ্গে তাও শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আবদুল বলত—

'একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকা ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।........

'তারপর সে এক কাণ্ড! দেখি এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফ জোড়া, ঝড়ের সময় সে উঠেছিল ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড় চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, আও বাচ্ছা! সে সামনের দু'পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্য যতই ছট্‌ফট্‌ করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আবদুল, সে মরে গেল নাকি?

আবদুল বললে, মরবে তার বাপের সাধ্যি কী? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্চাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ পনের ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পেঁছে দিলে। তার পরের কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।

আমি বললুম, আচ্ছা বেশ বাঘ তো হলো, এবার কুমির?

আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হলো। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে নিয়ে চলল। বেদেনী একবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে সেই দানো গিরগিটির গলায় পোঁচের পর পোঁচ লাগালো। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, তারপরে?

আবদুল বলল, তারপরেরকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছেবার যখন দেখা হবে খবর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা। কিন্তু আর তো সে আসেনি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।'

এমনিভাবেই আপন খেয়ালে মনের মধ্যে নিজের একটা জগৎ তৈরি করে সেই ছেলেবেলা থেকেই রবি কাটাত তার দিন। একদিন যে কবি জনতার সমুদ্রের মধ্যেও নির্জন একটা দ্বীপ বেছে নিয়ে আপন সাধনায় থাকবেন ব্যস্ত তাঁর পক্ষে হয়ত এটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাটা যেন আর সবার মত নয়। কোথায় যেন একটা পার্থক্য রয়ে গেছে আর

সবার সঙ্গে।

তেতলায় মহর্ষির ঘর, খাজাঞ্চিখানার বারান্দায় বাতিল আসবাবপত্রের মধ্যে সেই মুঘলি কায়দার পাল্কির পাশাপাশি আরো একটা জায়গা টানত রবিকে। সে জায়গাটার নাম গোলাবাড়ি। জোড়াসাঁকোর বাড়ির উত্তরদিকে ছিল যে ফাঁকামত একটা জায়গা —তার নাম ছিল গোলাবাড়ির মাঠ। নাম থেকেই বোঝা যায় এককালে সেখানে সার বেঁধে থাকত ধানের মড়াই বা গোলা। জমা থাকত সম্বৎসরের খোরাকির চেয়েও অনেক বেশি ধান। কিন্তু দ্বারকানাথের সময় থেকেই এ ব্যাপারটায় নজর কম দেওয়ায় কমতে কমতে একসময় গোলা উধাও হয় ওই জায়গা থেকেও। গোলা উধাও হলেও থেকে যায় তার নামটা। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা ওইখানেই করতে থাকে খেলাধুলা।

কিন্তু সে তো বিকেলবেলা। রবি কিন্তু সময় পেলেই চলে আসত সেখানে। ঘুরত আপনমনে একা একাই। কেন সেটা তারও জানা নেই। তবে বোধহয় শাসনদারদের চোখ রাঙানি নেই —পদে পদে বাধা নেই বলেই জায়গাটার প্রতি ছিল তার আকর্ষণ। নিজের মনেই কল্পনার ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে একসময় তাতে সওয়ার হয়ে বসত রবি। তারপর ছুটত সেই ঘোড়া টগবগ করে কত দেশ—কত নগর—যার কোনটা হয়ত আছে, কোনটা নেই, তা পার হয়ে রবি বনে চলে যেত এক অচীন লোকে—মগ্ন থাকত সে নিজের মধ্যেই।

তখন থেকেই এই পৃথিবী—এর মাটি, গাছপালা, পাথর সবকিছুর প্রতিই রবির ছিল একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। ফাঁক পেলেই চুপিচুপি সে তাই চলে আসত এখানে। তারপর শুরু হয়ে যেত কথা। গাছপালা, প্রজাপতি, ফুল সবার সঙ্গে কত কথাই না হত তার।

ওইরকম কথাবার্তা বলতে বলতেই রবির মনে হত—এই পৃথিবীটা একটা মস্ত শক্ত মলাটে মোড়া। আমরা তার

ওপরটাই শুধু দেখছি। যদি মলাটটা খোলা যেত তাহলে তার ভেতরটাও দেখা যেত বেশ। দেখা যেত বাইরের পৃথিবীটার চেয়ে ভেতরের পৃথিবীটা আরো অনেক বেশি মজার।

সেই মজাটা পাওয়ার জন্যই রবি দিনরাত ভাবত কেমন করে পৃথিবীর ওই মলাটটা খোলা যায়। কত 'প্ল্যানই' না সে করত। তার মনে হত, একটার পর একটা বাঁশকে যদি ঠুকে ঠুকে পোঁতা হয়—তাহলে একসময় পৃথিবীর ওই তলাটার নাগাল পাওয়া যেত। কিন্তু প্ল্যান পর্যন্তই, কে আর তাকে অত বাঁশ দেবে—কেইবা ওগুলোকে ঠুকে ঠুকে পুঁতে দেবে—তাই রবির প্ল্যান প্ল্যানই থেকে যেত।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হত মাঘোৎসব। উৎসবটা ছিল একদিনের—কিন্তু তার আয়োজনটা শুরু হয়ে যেত অনেক আগে থেকেই। বড় বড় কাঠের থাম পুঁতে তাতে টাঙানো হত ঝাড়। তাই পয়লা মাঘ থেকেই উঠোনে মাটি কাটা শুরু হয়ে যেত ওসব থাম বসাবার জন্য।

মাটি কাটা শুরু হলেই বিরাট আগ্রহ নিয়ে রবি বসে থাকত ওখানে। ভাবত ওইভাবে মাটি কাটতে কাটতেই একসময় পেঁছে যাওয়া যাবে পৃথিবীর গভীরে। ওপরের শুকনো ঝুরো মাটির পর যখন ভিজে কাদামাটি উঠত, তখন রবি ভাবত এইবার আরেকটু খুঁড়লেই পাওয়া যাবে পৃথিবীর তলাটা। কিন্তু ওই আরেকটু খোঁড়াটা আর হত না কোনদিন। তাই পৃথিবীর তলাটা দেখাও হত না রবির।

তবে হাল ছেড়ে দেবার ছেলে রবি কোনদিনই নয়। তাই অনেক বলে কয়েও কাজের ওই লোকগুলোকে দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে পৃথিবীর তলাটা বের করাতে না পেরে সে নিজেই লেগে যেত সে কাজে। একটি বাখারি নিয়ে গোলাবাড়ির মাঠে সে খুঁড়তে থাকত মাটি। তাতে মাটি যত না কাটা হত তার চেয়ে অনেক বেশি ঝরত ঘাম। তবু কোনদিনই রবি পেঁছতে পারেনি এই পৃথিবীর

তলায়। তাই তার আবিষ্কারটাও কোনদিন আর হয়ে ওঠেনি।

এসময় বড় রাগ হত রবির। বড়রা কিছুতেই কোন কাজে সাহায্য করবে না ছোটদের। কিছু করলেই বলবে—পাকামো কোরো না। অথচ নিজেরা যা করে—তার বেলায়? তবু কি আর করা যাবে? বড়রা বড়ই, আর ছোটরা যে ছোট। তাই তাদের সব কাজেই বাধা দেয় বড়রা। রবির মনে হত, আসলে বড়রা বড় কৃপণ—তাই অমন করে।

সেদিন 'বোধোদয়' পড়াবার সময় পণ্ডিতমশাই বললেন, আকাশের ওই নীলটা—যেটা ঘেরা টোপের মত ঘিরে আছে আমাদের পৃথিবীকে—ওটা কিন্তু মোটেই বাধা নয়। যদি সিঁড়ির ওপর সিঁড়ি লাগিয়ে ওপরে উঠে যাও—তাহলে দেখবে—কোথাও কোন বাধা নেই—কোথাও ঠেকছে না মাথা।

পণ্ডিত মশাইয়ের কথাটা শুনে অবাক হয়ে যায় রবি—আবার একটু রাগও হয়। আকাশের নীলটা যে ফাঁকা এটা তার কাছে অবাক হওয়ার মতই ব্যাপার। কিন্তু সিঁড়ি নিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের কৃপণতা তার মনে এনে দিত রাগ। কেন শুধু সিঁড়ির উপর সিঁড়ি? আরো আরো অনেক সিঁড়ি দিলেই তো সহজে পেঁছনো যায় আকাশে—পরখ করা যায় ব্যাপারটা। তাই সুর চড়িয়ে রবি শুধুই বলে যায়—সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি—আরো আরো সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে একসময় আলা হয়ে পড়ে রবি। দেখে সিঁড়ির সংখ্যা অত বাড়িয়েও আকাশে পেঁছনো গেল না কোনমতেই। আর তখনই অবাক হয়ে রবি ভাবে, সিঁড়ি না লাগিয়েই নীল আকাশের ওই অদ্ভুত খবরটা কি করে পেতে হয় তা জানেন একমাত্র মাস্টার মশাইরাই। তাই রবি ক্ষান্ত দেয় সিঁড়ির ওপর সিঁড়ি বসানোয়। মন দেয় সে অন্য কাজে।

তবে ওই যে, বড়দের বিশ্বাস করা যায় না কোনমতেই—তাই এরপর রবি যা করে তাতেও বড়দের কোন সাহায্য পাওয়া যায়

না—সায়ও না।

রবিদের পাশের বাড়ি—গুণদাদাদের বাগানে ছিল একটা নকল পাহাড়। সেই পাহাড় দেখে রবিরও ইচ্ছে হলো পাহাড় করার। ইচ্ছে মাত্রই কাজ। সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গুণদাদার বাগানের সেই পাহাড় থেকে ছোট ছোট পাথর, নুড়ি চুরি করে রবি পড়ার ঘরের এককোণে বানিয়ে ফেলল ছোটখাটো একটা পাহাড়। পাহাড়ের ফাঁক ফোঁকরে বসল নানা ফুলের কাজ। তারপর নিত্য তাতে মাটি, জল, সার দিয়ে এমনই সেটার যত্ন শুরু করল যে গাছগুলি তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে যেন বেঁচে গেল।

পাহাড়ের প্রতি কিন্তু রবির ছিল একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। ওটা দেখলেই মনটা ভরে যেত আনন্দে। কিন্তু নিজেদের সৃষ্টি অন্যদের না দেখালে আনন্দ পূর্ণ হয় না—তাই আনন্দের আতিশয্যে রবি একদিন বড়দের ডেকে নিয়ে এসে দেখাল পাহাড়টা। পাহাড় দেখে আনন্দ পাওয়া বা প্রশংসা করার বদলে ভুরু কুঁচকে উঠল বড়দের। ছিঃ ছিঃ! পড়ার ঘরে এসব কি আবর্জনা! তাই পরদিনই রবি দেখল ঘর থেকে উধাও হয়েছে পাহাড়, গাছ সব। সেদিন চোখের জল ফেলে রবি বুঝেছিল—বড়রা ছোটদের শিল্পের কদর করতে জানে না—আসলে বড়রা শিল্পের কিছু বোঝেই না।

॥ ২ ॥

আজ থেকে ১২৭ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ৭ মে বা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর জন্মের ১০৪ বছর আগেই ইংরেজ এদেশে ভালভাবে কায়েম হয়ে বসেছে আর ৪ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম বিদ্রোহ—সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজরা এদেশে আসার পর যেসব সাধারণ মানুষ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ বড়লোক হয়ে উঠেন—রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ

পঞ্চানন ঠাকুর তাঁদেরই একজন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর তো অর্থ আর বিলাসিতার জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ নামেই ইংরেজের কাছে পরিচিত ছিলেন। শুধু কলকাতা নয়—সারা দেশের ধনী এবং অভিজাত মহলেই ছিল ঠাকুর পরিবারের নাম।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ও ঠাকুর পরিবারের অবস্থা তেমনই রমরমা ছিল—একথা মনে করলে কিন্তু একটু ভুল করা হবে। তখনকার অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে তাঁর ৭০ বছর বয়সের সময় বলেছেন—

'আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি,...পূর্বযুগের নানা পাল পার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে এতদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরেও পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।'

রবীন্দ্রনাথের আগে তাঁর তেরটি ভাইবোন জন্মে গেছেন। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, নানারকম সমাজসেবা এসব নিয়ে বছরের বেশিটা সময়ই কাটান বাইরে বাইরে। মা সারদা দেবী ব্যস্ত থাকেন সংসারের নানা কাজের মধ্যেই। তাই মা'র কাছে থাকাটা খুব বেশি হয়ে ওঠেনি রবীন্দ্রনাথের। তাছাড়া তখনকার রেওয়াজটাই ছিল একটু অন্য রকমের। নানা বাধা-নিষেধে ছোটদের জীবনটাই তখন জেরবার। তারা বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না—তাতে পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট হবে—আভিজাত্যে আঘাত লাগবে। তারা অন্দরমহলে মা, ঠাকুমা, কাকিমা, জেঠিমাদের কাছে যেতে পারবে না—কেননা তাতে তাঁদের আরামের ব্যাঘাত হবে। তাই শিশুদের থাকতে হতো বাইরের মহলে চাকর-বাকরদের হেফাজতে।

শুধু তাই নয়, তাদের পোশাক-আশাকও ছিল খুবই সাধারণ

রকমের। বলা যেতে পারে কিছুটা অনাদর আর অবহেলার মধ্য দিয়েই মানুষ হত তারা। তাই যে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ বিলাস আর বৈভবের জন্য 'প্রিন্স' নামে পরিচিত, মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গেও যাঁর ছিল হৃদ্যতা, বাবা দেবেন্দ্রনাথ একসময় জুতোর ওপর সোনার জরি আর মণিমাণিক্য বসিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতেন—তাঁদের বংশধর হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁর ভাইবোনেরা মানুষ হয়েছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'বয়েস দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনদিন কোন কারণে মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই ছিল যথেষ্ট।'

এইভাবে মানুষ হবার ফলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চেহারা শরীর স্বাস্থ্য সবই ছিল অসম্ভব রকমের ভাল। সেই ছোটবেলাতেও কোনদিন জ্বর জ্বালাতেও ভুগতে হয়নি তাঁকে। অন্যদিকে, এই অনাদর, অবহেলা—মনে মনে তাঁকে বড় একা বড় নির্জনের পিয়াসী কিংবা অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। সবকিছুকে যেমন তিনি সহজভাবে দেখতে শেখেন—তেমনি সবের মধ্যেই খুঁজে পান একধরনের আনন্দকে।

এই আনন্দে মেতেই ছোট্ট রবি তৈরি করে নিয়েছিল তার নিজের মনের মত কতকগুলো খেলা। সেইসব খেলার একটা ছিল মাস্টার আর ছাত্রর খেলা।

সিঁড়ির রেলিংগুলো হতো ছাত্র আর মাস্টার স্বয়ং রবি। রবি ছিল ডাকসাইটে মাস্টার। তার সামনে একদম চুপচাপ থাকত তার রেলিং ছাত্রগুলো। মুখ দিয়ে তাদের টুঁ শব্দটি বেরুতো না। কিন্তু ওই যে যেমন দিনের পর রাত্রি আসে কিংবা চাঁদনী রাত শেষ হয়ে একসময় অন্ধকার আসে বলেই দিনের সূর্য বা রাতের চাঁদের এমন কদর, তেমনি দুষ্টু ছেলে না থাকলে শিষ্ট ছেলেগুলোকেই বা ভালবাসবে কে? তাই রবির চুপচাপ থাকা রেলিং ছাত্রগুলির মধ্যেও দু একটা ছিল মস্ত বেয়াড়া। কিছুতেই

মন বসে না তাদের পড়ায়। সামান্যতেই তারা ঝনঝন করে বেজে ওঠে—হেসে ওঠে খলখল করে।

এই দুষ্টু ছাত্রগুলিকে সামাল দিতে গিয়েই হিমসিম খেয়ে যেত রবি। ছাত্রদের মারধর করাটা সেই ছোটবেলা থেকেই ছিল রবির না-পছন্দ। তাই চলত তার বকাবকি, ওরে লেখাপড়া না করলে মানুষ হবি কি করে? শেষে বড় হয়ে যে কুলিগিরি করতে হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। রেলিং ছাত্র সমানেই চালিয়ে যায় বেয়াদপি। শেষে রবির মত মাস্টারও হাতে তুলে নেয় লাঠি। রেলিং ছাত্রের ওপর পড়তে থাকে ঘা। মারের চোটে গা তাদের ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়—তবু থামে না দুষ্টুমি। আসলে দুষ্টুমি বন্ধ হলে যে খেলাটাই যায় বন্ধ হয়ে। তাই রবিই বন্ধ করতে দেয় না ওই দুষ্টুমি।

রেলিং ছাত্র নিয়ে খেলাটা ছাড়া আরেকটা খেলাও ছিল রবির বড় প্রিয়। তার ছিল একটা কাঠের সিংহ। কে দিয়েছিল তাকে তা আর মনে নেই, কিন্তু রবি তার ওই কাঠের সিঙ্গিটি নিয়ে মেতে থাকত এক নতুন খেলায়।

মা-কাকিমার কাছে রামায়ণ, মহাভারত আর নানা পুজোর গল্প শুনে শুনে রবির মনে বলি দেবার বিষয়টা বেশ একটা বড় জায়গা করে নেয়। সে ঠিক করে সেও বলি দেবে।

ঠাকুরের কাছে পাঁঠা বলি বা মোষ বলি হত এটা সে জানত। কিন্তু রবি ঠিক করে তার ঠাকুরের কাছে সে পাঁঠা বা মোষ বলি দেবে না, সে বলি দেবে সিংহ—তার ওই কাঠের সিঙ্গিটাকে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কাঠের সিঙ্গিকে সে বলি দিতে থাকল কাঠের খাঁড়া দিয়ে। এতে সিঙ্গিটার রং চটত, খাঁড়াটাও ভাঙত কিন্তু সিঙ্গিটা থেকে যেত প্রায় একই রকম।

এই সিঙ্গি বলি দেবার মন্ত্রটাও তৈরি করেছিল রবি নিজেই। মন্ত্র ছাড়া যে বলি হয় না, পুজো হয় না এটা রবি জানত। তাই

সিঙ্গি বলির জন্য তৈরি করল একবারে নতুন একটা মন্ত্র। মন্ত্রটা এইরকম—

সিঙ্গিমামা কাটুম্
আন্দিবোসের বাটুম্
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড় কুড়্
আখরোট বাখরোট খট্ খট্ খটাস—
পট্ পট্ পটাস।

অনেক পরে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এর মধ্যে সব কথাই ধার করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস্ শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।'

এমনি সব নানা খেলা রবি বানিয়ে নিয়েছিল নিজে নিজেই। এককালে যিনি এমনভাবেই নানা কিছু রচনা করে সারা বিশ্বকে মাতিয়ে দেবেন—এ যেন তারই পূর্বাভাস। এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি। ভোরের আকাশটা দেখে যেমন বোঝা যায়—সারাটা দিন কেমন যাবে—রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার এইসব ঘটনাও তেমনি দিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। তখন অবশ্য তা কেউ বুঝত, কেউ বুঝত না।

॥ ৩ ॥

এই বোঝার কথাতেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই ছেলেবেলার জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত আট। সেইসময় তাঁকে কবিতা লিখতে শেখালেন তাঁরই ভাগ্না জ্যোতিপ্রকাশ। জ্যোতিপ্রকাশ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়। সদ্য সেক্সপিয়র পড়া শুরু করেছেন। হ্যামলেট থেকে মনে মনে প্রায়ই সংলাপ আওড়ান।

এক দুপুরবেলায় সেই জ্যোতিপ্রকাশ তাঁকে ঘরে ডাকলেন। বললেন দেখ, তোমাকে কবিতা লিখতে হবে।

কথাটা শুনে রবি তো অবাক। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তার মনে প্রথম ছন্দের কাঁপন জাগিয়েছিল সত্যি, তা বলে নিজেকে কবিতা লিখতে হবে এমন ভাবনাটা আসেনি মোটেই। কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশ বলল, তোমাকে পয়ারে কবিতা লিখতে হবে।

পয়ার কথাটা রবির কানে যেন আরও খটমট হয়ে বেজে উঠল। তাই তার বিস্ময়ভরা মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাটা—পয়ার! সেটা আবার কি?

ছন্দ। পয়ার হচ্ছে একরকম ছন্দ। একদম সোজা ব্যাপার। একবার বুঝতে পারলে আর দেখতে হবে না—একবারে গড়গড় করে কবিতা বেরুতে থাকবে। লোকে বলবে এসব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। বাব্বা তখন রবির কি গম্ভীর ভাব—কত নাম!

রবি কিন্তু আগের কথার জের টেনে বলে, কিন্তু পয়ারটা লেখে কেমন করে তা বলবে তো?

বললাম না, সোজা, একেবারে জলের মতো। ঠিক করে বারকয়েক লিখলেই একেবারে কলের জলের মতই বেরুতে থাকবে কবিতা।

জ্যোতিপ্রকাশের এই কথাটা বোধহয় মনে একটা প্রেরণা আনল। তাই সে বলে, কিন্তু পয়ার কেমনভাবে লেখে?

বলছি, মন দিয়ে শুনে নাও। প্রতি লাইনে থাকবে ১৪টা করে অক্ষর। এখন প্রথম লাইনের শেষ অক্ষরটার সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষ অক্ষরটার মিল দিতে হবে। যেমন জল ফল, পাখি রাখি, বই কই—এই রকম আর কি।

ভাগ্না জ্যোতিপ্রকাশের কাছ থেকে পয়ার লেখার কৌশলটি রপ্ত করে নিয়েই রবি কবিতা লিখতে শুরু করল। আর কিছুক্ষণ লেখার পরেই তার মনে পড়ল সেই চোরটার কথা।

বেশ কিছুদিন আগের কথা সেটা। বাড়িতে হঠাৎ রব উঠল—

চোর, চোর। চোর ধরা পড়েছে দেউরিতে। আর সবার সঙ্গে রবিও গেল সেই চোরকে দেখতে। মনের মধ্যে তার একটা ভয় ভয় ভাব থাকলেও কৌতূহলের টানেই সে গিয়েছিল চোর দেখতে। দেউরিতে গিয়ে সে কিন্তু অবাক, কোথায় চোর, ওতো তাদেরই মত একটা মানুষ। এ আবার চোর হবে কি করে? সেই সময়ই দারোয়ান সেই চোরটাকে মারতে শুরু করল। দারোয়ানের মার দেখে রবির মন কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। বারবারই তার মন বলতে থাকল, মানুষ আবার চোর হয় নাকি? মানুষ এমন করে আরেক-জন মানুষকে মারে কেন, মারবেই বা কেন?

মানুষের প্রতি এই যে ভালবাসা তার পরিচয় কিন্তু পরেও অজস্রবার পাওয়া গেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী জার্মানি যখন অহেতুক যুদ্ধ ঘোষণা করে মানুষ মারতে শুরু করে তখনও রবীন্দ্রনাথ জোর গলাতেই জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ। শুধু মানুষই বা কেন, এই ভালবাসা, প্রেম এটা ছিল তাঁর জীবজগতের সবার প্রতিই। পদ্মার বোটে থাকার সময় একদিন একটা পালিয়ে যাওয়া মুরগির ওপর খানসামার ঝাঁপিয়ে পড়া এবং তাকে কাটা দেখে রবীন্দ্রনাথ এমনই ব্যথা পেয়েছিলেন মনে যে তিনি মাংস খাওয়াটাই ছেড়ে দেন।

এই পশুপ্রেমই তাঁকে পরে 'বিসর্জন' নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে নাটকে তিনি পশুবলির বিরোধিতাও করেছিলেন তীব্রভাবে।

যাইহোক, ছোট্ট রবির সেদিন কবিতা লিখতে গিয়েও হয়েছিল সেই চোর দেখার মত অবস্থা। ভাগ্না জ্যোতিঃপ্রকাশের কথামত মিল রেখে কয়েক লাইন পয়ার লেখার পরই রবির মনে হ'ল—এই নাকি কবিতা, এতো সবাই লিখতে পারে। সবাই যখন পারে, তখন রবি তো পারেই—তাই সব ফেলে শুরু হয়ে গেল তার কাব্যসাধনা।

এখন কাব্যসাধনার জন্য ভাল খাতা চাই। সেটি কোথা থেকে

পাওয়া যায় এই ভাবনাটা রবিকে অবশ্য বেশিক্ষণ দমিয়ে রাখতে পারল না। সেরেস্তার একজন কর্মচারী তাকে একটি নীল কাগজের খাতা দিল। সেই খাতা পেয়ে রবির কি ফূর্তি—এবার তার কাব্যসাধনা ঠেকায় কে?

বাড়ির মধ্যেই সে একটু নির্জন জায়গা খুঁজে নিয়ে সেই খাতায় পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো অসমান লাইন কেটে বড় বড় কাঁচা অক্ষরে লিখতে শুরু করল কবিতা।

শুধু কবিতা লিখলেই তো হবে না, সে কবিতার সমঝদার শ্রোতা চাই, চাই প্রাচীন কালের রাজা-রাজড়ার মত একজন পৃষ্ঠপোষক। রবির কপাল এদিক থেকেও ভাল। রবির দাদাই এগিয়ে এলেন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে—শ্রোতা জোগাড়ের দায়িত্বটাও তিনিই তুলে নিলেন কাঁধে। ভাইয়ের কবিতায় আনন্দে ডগমগ দাদা যাকে পায় তাকেই শোনায় ভাইয়ের কবিতা।

ঠাকুরবাড়িতে সেদিন এসেছেন জাতীয় হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা, 'ন্যাশন্যাল পেপার' কাগজের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই পাকড়াও করলেন দাদা। বলে উঠলেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটি কবিতা লিখেছে, শুনুন না।'

নবগোপালবাবু কিছু বলার আগেই দাদা রবিকে ডেকে হুকুম করলেন, রবি তোমার কবিতাগুলো নবগোপালবাবুকে পড়ে শোনাও।

হুকুম পেয়ে রবিরও কবিতা শোনাতে এতটুকু দেরি হ'ল না। তখনও তেমন বেশি লেখা তার হয়নি। তাই নিজের সৃষ্টি সব-সময়ই ঘুরত তার জামার পকেটে পকেটে। পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' বইতে সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে বলেছেন, 'নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক—এই তিনে-এক একে-তিন ছিলাম।'

যাইহোক, দেউড়ির সামনেই পকেট থেকে কাগজ বের করে রবি চেঁচিয়ে পড়তে থাকল তার কবিতা। পদ্মের ওপর লেখা সেই কবিতাটা শুনে নবগোপালবাবু একটু হেসে বললেন, বেশ

হয়েছে কবিতাটা, কিন্তু ওই 'দ্বিরেফ্' শব্দটার মানে কি ?

এর আগে আমলামহলে রবি যখন কবিতাটা শুনিয়েছিল তখন অনেককেই সে ঘায়েল করেছিল ওই 'দ্বিরেফ' শব্দটা দিয়ে। কেমন করে—কোথা থেকে সে শব্দটা সংগ্রহ করেছিল, সেটা আর তার খেয়াল নেই। 'দ্বিরেফ'-এর বদলে 'ভ্রমর' লিখলেও ছন্দপতন বা মানের হেরফের হ'ত না এটা জানা সত্ত্বেও 'দ্বিরেফ' শব্দটার প্রতি রবির ছিল সবচেয়ে বেশি আস্থা। অথচ সেই শব্দটা নিয়েই কূট প্রশ্ন তুলে নবগোপালবাবু হেসে চলে গেলেন দেখে রবি প্রথমে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপরই অবশ্য তার সিদ্ধান্তে আসতে এতটুকু দেরি হয়নি। সে বুঝেছিল— নবগোপালবাবু মোটেই সমঝদার শ্রোতা নন—আর এইটে বুঝে নিয়ে সে আর কোনদিন নবগোপালবাবুকে কবিতা শোনায় নি।

নবগোপালবাবু সমঝদার শ্রোতা না হলেও রবির কিন্তু কিছু সমঝদার শ্রোতা জুটে গিয়েছিল সহজেই। তাদের উৎসাহ আর অনুপ্রেরণাতেই রবির কবিতার তরী এগিয়ে চলে একবারে তরতর করে। এই সমঝদার শ্রোতাদের একজন হলেন শ্রীকণ্ঠবাবু।

শ্রীকণ্ঠবাবু হলেন সেইসব আশ্চর্য জাতের মানুষ—যাঁরা আলাপ থাক বা না থাক স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরেই যে কোন মানুষকে আপন করে নিতে পারেন, যাঁদের বয়স কোনসময়ই বাড়ে না অথবা বলা যায় থার্মোমিটারের পারা যেমন বিভিন্ন তাপমাত্রায় ওঠা নামা করে এঁরাও তেমনি যখন যে বয়সের মানুষের সঙ্গে মেশেন তখন সেই বয়সেরই হয়ে যান।

শ্রীকণ্ঠবাবু বয়সে বৃদ্ধ। মাথা ভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো। মুখে একটিও দাঁত নেই কিন্তু হাসি আছে সব সময়। পাকা বোম্বাই আমের মত শ্রীকণ্ঠবাবুর সবটাই মিষ্ট রসে ভরা। পারসি পড়া মানুষটি ছিলেন রসের ভাণ্ডারী।

শ্রীকণ্ঠবাবু একই সঙ্গে রবি, তার দাদাদের এবং বাবার বন্ধু ছিলেন। রসে টইটম্বুর না হলে এটা যে সম্ভব নয় তা সহজেই

বোঝা যায়। এই শ্রীকণ্ঠবাবু ছিলেন রবির মস্ত সমঝদার শ্রোতা। অবশ্য শুধু কবিতা কেন, রবির গান, রবির চেহারা সবকিছুর প্রশংসায় সব সময় মুখর থাকতেন তিনি।

রবি তখন যেসব কবিতা লিখত তার একমাত্র বোদ্ধা শ্রোতা ছিলেন এই শ্রীকণ্ঠবাবু। আর রবিও শ্রীকণ্ঠবাবুকে পেয়ে কবিতার পর কবিতা লিখে, তাঁকে শুনিয়ে অবাক করে দিত। সেই কবিতা লেখার তাগিদে রবি সে সময় কয়েকটি ঈশ্বর স্তবও লেখে। তাতে এই সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকুলতা।

কবিতা শুনে শ্রীকণ্ঠবাবু তো মোহিত। বলেন, এমন কবিতা তিনি জীবনে শোনেননি। তাঁর ধারণা, এ কবিতা দেবেন্দ্রনাথ শুনলে একেবারে মোহিত হয়ে যাবেন। তাই রবির সে কবিতা নিজে নিয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে শোনান। পয়ার ছন্দে লেখা সে কবিতা আর বিষয়বস্তুর গম্ভীরতা দেখে দেবেন্দ্রনাথ সেদিন হো হো করে হেসেছিলেন।

তবে সেদিন হাসলেও এই দেবেন্দ্রনাথই কিন্তু একদিন রবির গান শুনে তাকে পুরস্কৃত করেন। অবশ্য রবি তখন তাঁর আর ছোট্ট রবিটি নেই। রবি তখন কবি রবীন্দ্রনাথ। সেবার রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে সকালে এবং বিকেলে গাইবার জন্য অনেকগুলো গান লেখেন।

দেবেন্দ্রনাথ সে সময় ছিলেন চুঁচুড়ায়। কেমন করে তাঁর কানেও পেঁছিল, রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে অনেকগুলি চমৎকার গান লিখেছেন। খবরটা পেয়েই তিনি লিখে পাঠালেন জ্যোতি আর রবিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

মহর্ষির ডাক পেয়ে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এলেন চুঁচুড়ায়। তারা আসতেই দেবেন্দ্রনাথ বললেন, রবি, তুমি নাকি অনেকগুলো নতুন গান লিখেছ, আমাকে সেগুলো গেয়ে শোনাও তো!

বাবার কথামত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বসলেন হারমোনিয়ামে আর রবীন্দ্রনাথ গাইতে থাকলেন একের পর এক তাঁর নতুন লেখা গান। গানগুলির মধ্যে বিখ্যাত 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'—গানটিও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ চোখবুজে শুনে যান গান। কোন কোনটি দু'তিনবারও গাইতে হয় রবীন্দ্রনাথকে।

গানের শেষে অভিভূত দেবেন্দ্রনাথ বললেন, 'দেশের রাজা যদি ভাষা জানত ও সাহিত্যের আদর বুঝত তবে কবিকে তো তারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক থেকে যখন তার কোন সম্ভাবনাই নাই তখন আমাকেই সেটা করতে হবে।' তারপর চেক বইটা বের করে রবীন্দ্রনাথের নামে তিনি পাঁচশ টাকার একটি চেক কেটে দেন।

নীল ফুলসকেপের খাতায় যখন রবির কাব্যচর্চা চলছে তখন সে নর্মাল স্কুলের ছাত্র। সে সময় কবিতা লেখাটা ছাত্রদের পক্ষে খুব একটা অগৌরবের কাজ ছিল না। তাই কেউ কবিতা লিখলে যেমন তা প্রকাশ করতে ভয় পেত, তেমনই আবার তা সবাইকে না জানিয়েও স্বস্তি পেত না। ছোট্ট রবিরও হ'ল সেই দশা। তার কবিতার কথাটা সে নিজেই বলুক আর অন্য কেউ তার কাছ থেকে শুনেই বলুক—মোটমাট একদিন তা মাস্টারমশাইদের কানে উঠল।

নর্মাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত রবিদের শ্রেণীতে পড়াতেন না, কিন্তু লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি নিজে 'প্রাণিবৃত্তান্ত' নামে একটা বইও লিখেছিলেন। সম্ভবত সেটাই তাঁর সাহিত্যপ্রীতির কারণ। তিনি একদিন রবিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি কবিতা লেখ ?

রবির তখন হরিণের নতুন শিং ওঠার মত অবস্থা। কোন কিছু দেখলেই গোঁতাতে ইচ্ছে করে। সে নিজেই তখন তার কবিতা লেখার কথা প্রচারে ব্যস্ত এসময় তাকে জিজ্ঞেস করায় সে গড়গড় করে বলে গেল যে সে কবিতা লেখে, অনেক কবিতা সে লিখেছে ইত্যাদি।

সাতকড়িবাবু সেদিন বেশ, বেশ, বলে তারিফ করে তাকে বিদায় করলেন। কিন্তু এরপর থেকেই মাঝে মাঝে তিনি দুই এক পদ কবিতা লিখে তা পূরণ করার জন্য রবিকে দিতেন। একবার তিনি লিখলেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা ছিল আর ভয় নাই।

রবি সেই কবিতা বাকি ছত্রগুলি পূরণ করে লিখলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

এভাবে শুধু পাদপূরণ নয়, রীতিমত কবিতাও রবি লিখে ফেলে বেশ কিছু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিত এসব কবিতা। রবির লেখা ওই সময়ের আরেকটি কবিতা হ'ল—

আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

এমনি নানা কবিতা লিখে ওই বয়সেই রবি নর্মাল স্কুলে নিজের কবি খ্যাতি নিজেই প্রচার করতে থাকে। ওই স্কুলের সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট ছিলেন গোবিন্দবাবু। কালো মোটাসোটা, বেঁটে এই মানুষটি যখন কালো রঙের একটা চাপকান পরে স্কুলে আসতেন তখন ছেলেরা তাঁকে দেখেই কাঁপতে থাকত। খুব রাগী মানুষ ছিলেন তিনি। ছেলেরা অন্যায় করলে তার শাস্তিও দিতেন তিনি। এক কথায় ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন রীতিমত আতঙ্কের বস্তু।

এহেন গোবিন্দবাবুর ঘরে যখন রবির ডাক পড়ল তখন সে ভয়েই একসা। কি জানি কি আছে তার কপালে। রবির মনে পড়ে কয়েকদিন আগের ঘটনাটা। স্কুলের বড় ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রের নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচতে রবি সেদিন গোবিন্দবাবুর ঘরে

ঢুকে বসেছিল এবং গোবিন্দবাবু সেদিন শুধু তার চোখের জল দেখেই বড়দের শাস্তি দেন। আজ গোবিন্দবাবুর ডাক পেয়ে রবি ভাবে নিশ্চয়ই তিনি ওই ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলবেন। তাই দুরুদুরু বুকেই সে গোবিন্দবাবুর ঘরে এসে বলে, আসব স্যার।

গোবিন্দবাবু তাকে দেখে বলেন, ইয়েস, ঘরের ভেতরে এস।

রবি ঘরে ঢুকতেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন, তুমি নাকি কবিতা লেখ।

অসঙ্কোচেই রবি জানায় হ্যাঁ স্যার লিখি।

কি কবিতা লেখ?

এবার রবি একটু বিপদেই পড়ে। বুঝতে পারে না কি বলবে। তাই ভয়ে ভয়ে তার কবিতার খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই যে স্যার, এইসব।

গোবিন্দবাবু খাতাটা নিয়ে কবিতাগুলো পড়ে বেশ হাসিমুখেই বলেন, বাঃ! বেশ লিখেছ। তবে একটা কথা কি জানো, কবিতায় সব সময় একটা নীতিবোধ, একটা আদর্শকে তুলে ধরতে হয়। তা দেখ আমি তোমাকে একটা কবিতা লিখতে বলছি, এটা তুমি কালকে লিখে নিয়ে আসবে। এই বলে তিনি 'উচ্চ অঙ্গের সুনীতি' সম্পর্কে কবিতাটা লিখে আনতে বললেন।

পরদিন যথারীতি রবি তার খাতায় গোবিন্দবাবুর উপদেশমত একটা কবিতা লিখে আনল। সে কবিতা পড়েও গোবিন্দবাবু খুশি। তিনি যে কতটা খুশি হয়েছেন তা বোঝা গেল তারপরেই। রবিকে তিনি ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, এবার চেঁচিয়ে সবাইকে শোনাও কবিতাটা।

রবিও নিজের কৃতিত্ব দেখাবার এই সুযোগ পেয়ে বেশ চেঁচিয়েই কবিতাটা পড়ে সকলকে শোনায়। গোবিন্দবাবু আরেকবার রবিকে সাবাশ জানিয়ে সবাইকে বললেন, শিখে নাও, এইভাবে কবিতা লিখতে হয়।

গোবিন্দবাবু প্রশংসা করলেও ছাত্ররা কিন্তু রবির এ কৃতিত্বকে খুশি মনে মেনে নিতে পারল না। কেউ কেউ বলাবলি করতে

থাকে, এটা নিশ্চয়ই রবির লেখা নয়। অন্য কেউ লিখে দিয়েছে।

একজন তো বলল, অন্য কেউ নয়, এটা ছাপা কবিতার বই থেকে টুকে লেখা। সে ছাপা কবিতাটা দেখাতে পারে এমন পর্যন্ত বলল। তবে ছাত্ররা যাই বলুক, রবির কবিতা লেখা কিন্তু থেমে থাকল না। বরং সে লিখে চলল আরো—আরো কবিতা।

॥ ৪ ॥

রবির কবিতার না হলেও তার পড়ার সমঝদার ছিলেন তার মা সারদা দেবী। নানা কারণেই মাকে রবি কোনদিনই খুব নিবিড় করে পায়নি। কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছে রবি তার মা'র কাছেই ঘুরঘুর করেছে।

তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল এবং বারমহল ছিল পুরোপুরি আলাদা। অন্দরমহলে যেমন পুরুষরা যখন তখন আসতে পারতেন না, তেমনি ছোট ছোট ছেলেদেরও বেশিরভাগ সময়টাই কাটাতে হ'ত অন্দর আর বারমহলের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। রবির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রবির যখন দু'বছর বয়স তখন তার ছোট ভাই বুধের জন্ম। বুধ বেঁচেছিল মাত্র বছর খানেক। এই বুধের জন্মের পরই সারদা দেবী রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কোনদিনই তিনি আর পুরোপুরি ভাল হয়ে ওঠেন নি। আর রবির যখন ১৫ বছর বয়স সেই সময়ই সারদা দেবী মারা যান। ফলে রবি তেমনভাবে মা-কে কোনদিনই পায়নি। এর জন্য তার মধ্যে ছিল একটা মা-কাঙালেপনা।

কিন্তু রবি বরাবরই ছিল খুব চাপা স্বভাবের ছেলে। তাই নেহাত অল্প বয়সে তার সেই কাঙালেপনা অন্যের চোখে ধরা পড়লেও পরে কিন্তু কেউ সেকথা বুঝতে পারেনি। নিজের মনের দুঃখ এবং ব্যথার কথা পরকে না জানানোর একটা

প্রবণতা চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল প্রবল। তাই নিজের অতিপ্রিয় বড় মেয়ে বেলা যেদিন মারা যায় সেদিনও তিনি যথারীতি একটি সভায় যান এবং দেরির কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেন, আজ নিজের এক অতি প্রিয়জনকে হারিয়ে কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম—তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। সেই প্রিয়জন যে তাঁর বেলা—সেকথাও স্পষ্ট করে প্রকাশ করেননি তিনি।

একইভাবে মা'র কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেননি প্রায় কিছুই। তবু মাঝে মাঝে যখন প্রসঙ্গটা উঠত তখনই তাঁর কথায় টের পাওয়া যেত মা সম্পর্কে তাঁর একটা চাপা অভিমানের সুর।

সকালের দিকে রবি মা-কে প্রায় পেতই না। বিকেলের গা ধোয়ার পর মা তাঁর অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যখন বসতেন সেই সময়ই মাঝে-মধ্যে তাঁর রবি এসে বসত তাঁর কোল ঘেঁসে।

পৈতের পর দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে ভ্রমণে রবিকেও তাঁর সঙ্গী করে নেন। দীর্ঘদিন বাদে বাড়ি ফেরার পর অন্দরমহলে বিশেষ করে মা'র কাছে রবির খাতির বেশ বেড়ে যায়।

মা-কে কথায় কথায় রবি বলে, সে এবার বাল্মীকি রামায়ণ পড়েছে। বাবা তাকে সেই পাঠের ব্যাখ্যাও বলে দিয়েছেন।

ছেলের কথায় মাও বেশ খুশি হয়ে ওঠেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া থাকলেও বাল্মীকি রামায়ণ পড়া দূরে থাক, তার অনেককিছুই তাঁর জানা নেই। তাই রবিকে তিনি বললেন, 'বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়ে শোনা দেখি।'

ছাদের ওপর মা'র হাওয়া খাওয়ার বৈকালিক আসরে রবি-ই তখন প্রধান বক্তা। তারপর নিজে বড়াই করে বাল্মীকি রামায়ণের কথা বলেছে, তাই মা বলাতে রবি একটু বিপদেই পড়ল। কেননা, ঋজুপাঠ নামে যে বইতে রবি বাল্মীকির রামায়ণের কিছু কিছু অংশ পড়েছে তাতে রামায়ণের সবটা ছিল না। ফলে রবিরও সবটা পড়া হয়নি, আর যা পড়েছিল বা বাবার কাছে যা শুনেছিল

তাও ভুলে গেছে প্রায় সবটাই। তাই মা'র কথায় রবি পড়ল বিপদে।

বিপদে পড়লেও না বলে পিছিয়ে আসার ছেলে রবি নয়। তাই ওই বই নিয়েই শোনাতে বসল মা-কে। যেখানটা বুঝতে পারে না, অথবা যে জায়গাটা ভুলে গেছে সেটা সে নিজেই বানিয়ে বলে দেয়।

তার মুখে সংস্কৃত এবং তার ব্যাখ্যা শুনে মা তো রীতিমত মুগ্ধ। তাঁর ছোটছেলের এই কৃতিত্বর কথাটা বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রকে না জানিয়ে স্বস্তি পান না তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ততদিনে পণ্ডিত হিসেবে নাম কিনেছেন। মা'র বিশ্বাস রবির পাঠ শুনে দ্বিজেন্দ্রও মুগ্ধ হবেন। তাই তিনি তাকে বলেন, একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।

রবিতো পড়ল বিপদে। সংস্কৃত না জানা মা এবং তার সঙ্গী-সাথীদের ভুল-ভাল বলে রেহাই পেলেও দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সহজে ছাড়বেন না এবং ধরা পড়ে গেলে মা'র কাছে মান ইজ্জৎ সবই যে যাবে, এই ভাবনাটা পুড়িয়ে মারতে থাকে তাকে। তাই মা'র কথায় একরকম চুপ করেই যায় রবি। মা কিন্তু নিজেই লোক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রকে ডাকিয়ে এনে বলেন, রবি কেমন সংস্কৃত রামায়ণ পড়তে শিখেছে, একবার শোন না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন অন্য কি একটা যেন কাজ করছিলেন, তাই একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। মা'র কথায় রবির রামায়ণ পাঠ শুনলেও রামায়ণে তাঁর মন ছিল না। তবু মা'র কথা রাখতেই রবির রামায়ণ শোনেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। দু' একটা শ্লোকের পরই তিনি আর তার বাংলা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে রওনা দেন নিজের কাজে। যাবার আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্য বলেন, বাঃ, বেশ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ওই একটি কথাই রবির মনে বল আনে অনেক। বারে-বারেই সে মনে মনে বলে, মান রক্ষা করো ঠাকুর। রবির প্রার্থনা বোধহয় শুনলেন ঠাকুর। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ সেদিন বাংলা না

শুনে চলে গেলেন তাঁর নিজের কাজে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে রবির। মা কিন্তু তখন খুব খুশি। তাঁর এই ছোট ছেলে যে সংস্কৃত পড়তে পারে এই আনন্দেই তিনি মশগুল।

অবশ্য রবির ওপর মা'র ভরসাটা বোধহয় আগাগোড়াই একটু বেশি। দেবেন্দ্রনাথ তখন হিমালয় অঞ্চলে ঘুরছেন। এমন সময় কে যেন সারদা দেবীকে বললেন, রাশিয়া এবার ভারত আক্রমণ করবে। হিমালয় ছেঁদা করে তারা এবার ভারতে ঢুকে পড়বে।

কথাটা শোনার পরই ভয়ে কাঁপতে থাকেন সারদা দেবী। তাঁর ভয় কত্তা এখন বাড়িতে নেই, এসময় যদি রাশিয়ানরা আক্রমণ করে তাহলে কি হবে?

ব্যাপারটা নিয়ে সারদাদেবী যতই ভাবুন না কেন, অন্য কেউ এতে তেমন ভয়ের কিছু দেখল না। তাই সারদাদেবীর কথায় কেউ আর তেমন পাত্তা দেয় না।

নিরুপায় সারদাদেবী শেষে তাঁর ছোট্ট রবিকে ধরলেন। বললেন, যেমন করে পার কত্তাকে একটা চিঠি দাও। মা'র কথায় রবি বলল, আচ্ছা, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

মা ভরসা পেলেন, বিপদে পড়ল রবি। কেননা, সে তখন লিখতে পারলেও কেমন করে চিঠি লিখতে হয় তা মোটেই জানে না। বিশেষ করে বাবা দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মানুষ, তাঁকে যেমন তেমন ভাবে চিঠি লিখলে যে সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না—এটাই তার ভাবনা। অথচ মা-কে কথা দেওয়া আছে বাবাকে সে চিঠি লিখবে। অগত্যা রবি স্মরণ নিল তাদের দপ্তরখানার মহানন্দ মুন্সির। রবির আবদার মেটাতে মহানন্দ মুন্সিও সেরেস্তাদারির ভাষায় বেশ একটা জবরদস্ত চিঠি লিখে ফেলল রবির জবানিতে। তারপর সেটি দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দিল মহানন্দ মুন্সিই।

চিঠি পাঠাবার পর রবির দিন কাটতে থাকে একটা উত্তেজনার

মধ্যে আর সারদাদেবী প্রতীক্ষা করতে থাকেন দেবেন্দ্রনাথের। চিঠি দেবেন্দ্রনাথ যথাসময়েই পেলেন। কিন্তু নিজে না এসে তিনি সে চিঠির যে জবাব পাঠিয়ে দিলেন তার মধ্যে ছিল একটা উঁচুদরের রসিকতা। তিনি লিখলেন, ভয় করার কিছু নেই। রাশিয়ানরা হিমালয় পার হয়ে কখনই জোড়াসাঁকোতে পৌঁছতে পারবে না। তারা হিমালয় পার হবার চেষ্টা করলে তিনি একাই তাদের তাড়িয়ে দেবেন, তাই এই মুহূর্তে তাঁর কলকাতায় ফেরা সম্ভব নয়।

দেবেন্দ্রনাথের সে চিঠি পেয়ে সারদা দেবী যে খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন তা নয়, কিন্তু সে চিঠি রবির মধ্যে জেবলে দিয়েছিল একটা রীতিমত উত্তেজনার আগুন। রবির মনে হয়েছিল, তার বাবা এক মস্ত সাহসী পুরুষ নাহলে একা রাশিয়ানদের তাড়িয়ে দেবার কথা বললেন কি ভাবে ?

বাবার এই সাহস রবিকে বাবা সম্পর্কে আরো কৌতূহলী করে তুলল। তাই একটার পর একটা চিঠি লিখতে থাকল রবি তার বাবাকে। রবি লিখতে থাকল বললে অবশ্য ভুল হবে, কেননা যখন যা মাথায় আসত তাই নিয়েই রবি আসত মহানন্দ মুন্সির কাছে। তাকে বলত ওই বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতে।

একে ছেলে মানুষ, তার মনিবের ছেলে, তাই মহানন্দ রবির ফরমাশ মতো লিখে দিত চিঠি। কিন্তু গোল বাঁধল চিঠি পাঠান নিয়ে। চিঠি পাঠাবার জন্য যে একটা খরচ লাগে তা রবি জানত না। তাই চিঠি লেখা হয়ে গেলে সেটি মহানন্দর জিম্মাতেই রেখে দিত পাঠাবার জন্য। মহানন্দ উৎসাহের বশে প্রথম চিঠিটি পাঠালেও পরে বুঝতে পারল রবির ফরমাশ মতো যদি চিঠি পাঠাতে হয় তাহলে খরচ নিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হবে শেষকালে তাকেই। তাই তারপর থেকে রবির কথামত চিঠি লিখলেও সে চিঠি আর পাঠাত না। তা জমা থাকত তার দপ্তরেই। আর রবিও দিনের পর দিন চিঠির জবাবের আশায় আশায় থেকে ক্লান্ত

হয়ে শেষে একদিন চিঠি লেখাটাই ছেড়ে দিল।

তবে এই চিঠি লেখার ব্যাপার নিয়েও মা'র কাছে রবির কদর আরো বেড়ে গেল। কেননা, এসব ব্যাপারে রবির দাদারা মা'র কথায় একরকম কোন কানই দিত না। তাই মা তাঁর এই ছেলেটিকেই তাঁর মস্ত অবলম্বন মনে করতেন।

রবিও অনেক সময় তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলির কথা তার মা'র কাছেই প্রকাশ করত। রবিকে রোজ সন্ধ্যের সময় পড়াতে আসতেন মাস্টারমশাই। জল হোক ঝড় হোক, তিনি প্রতিদিনই আসবেন পড়াতে। অথচ রবির রোজ রোজ পড়তে ইচ্ছে করে না। বিশেষ করে যখন বৃষ্টি পড়ে, ঝড় ওঠে তখন সবকিছু ফেলে তার ইচ্ছে করে দুচোখ ভরে তা দেখার। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সেদিকে কড়া নজর। জানলার বাইরে দৃষ্টি ফেরালেই ধমকে উঠতেন তিনি।

পড়ায় রবির মন নেই দেখে মাষ্টারমশাই প্রায়ই বলতেন, সতীন নামে তাঁর আরেকটি যে ছাত্র আছে—সে একবারে সোনার টুকরো ছেলে। পড়ায় তার কি ঝোঁক। পড়তে পড়তে যদি ঘুম এসে যায় তবে চোখে নস্যি দিয়ে সে জেগে থাকে। এইরকম সব কথা বলে মাস্টারমশাই রবির মনে পড়ার জন্য একটা জেদ আনার চেষ্টা করতেন বোধহয়। কিন্তু রবির ক্ষেত্রে তার ফলটা হতো উল্টো। মাস্টারমশাই যত সতীনের কথা বলেন, ততই পড়ার ইচ্ছেটা হারিয়ে ফেলে রবি। বারবারই তার মনে হয় সতীনের অত ভাল হওয়ার দরকারটা কি?

মনে এসব ভাবলেও মাস্টারমশাইয়ের কাছে পার পাওয়ার জো ছিল না কোনমতেই। তাই মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য নানা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হ'তো রবিকে। রবির শরীরটা চিরকালই ছিল অসম্ভব রকম ভালো। জ্বর হয়েছে, সর্দি হয়েছে, এসব বলে ছুটি আদায় করাটা তার পক্ষে খুব একটা সহজ হতো না। তাই সে পেট কামড়ানির কথা বলত মা-কে। পেট কামড়ানিটা এমনই একটি ব্যামো—এ বাইরে থেকে বোঝা

যায় না। তাই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে রবি মা-কে গিয়ে বলত, মা দারুণ পেট ব্যথা করছে।

মা তখন তাঁর অন্যান্য সঙ্গিনীদের নিয়ে খেলা কিংবা গল্পে মশগুল থাকলেও ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন, পেট ব্যথার আসল কারণটা কী? মনে মনে হাসতেন তিনি। কিন্তু রবিকেও নিরাশ করতেন না। চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, যা মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।

মা-র ফরমান জারির সঙ্গে সঙ্গেই রবির পেট ব্যথাও যেত সেরে—সে তখন আপন খেয়ালে দেখত আকাশ—বৃষ্টি আরো কত কী?

॥ ৫ ॥

১৮৭৩ সাল। রবির বয়স তখনও ১২ পার হয়নি। মহর্ষি ঠিক করলেন এবার তিনি ছেলের পৈতে দেবেন। একই সঙ্গে তিনি রবির দাদা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগ্নে সত্যপ্রসাদেরও পৈতে দেবার আয়োজন করলেন।

তখন মাঘোৎসবের ধুম। তারপর এই প্রথম পুরোপুরি ব্রাহ্মমতে ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের পৈতে হচ্ছে তাই উৎসাহটা সবারই বেশি। ব্রাহ্মমতে পৈতে মানে নারায়ণ শিলা ইত্যাদি ঠাকুরপুজা বা হোমযজ্ঞ বাদ দিয়ে শুধুই বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে পৈতে। মহর্ষি নিজে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সঙ্গে পরামর্শ করে বৈদিক মন্ত্র চয়ন করে পৈতের নিয়মকানুন ঠিক করলেন। তারপর পৈতের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বেচারামবাবু দালানে তিন হবু ব্রাহ্মণকে বসিয়ে উপনিষদের সেইসব মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার রীতি শেখালেন। ওইসঙ্গে মন্ত্রগুলিও তিনি তাদের প্রায় মুখস্থ করিয়ে দিলেন।

পৈতের দিন মাথা নেড়া করে বীরবৌলি পরে তিন বটু

বসল। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ হ'ন পুরোহিত আর দেবেন্দ্রনাথ নিজে হ'ন আচার্য।

পৈতে তো হয়ে গেল। তিন নবীন ব্রাহ্মণেরই তখন দারুণ মজা। নেড়া মাথা। কানে ঝুলছে মাকড়ি। তাই ধরে তিনজনে টানাটানি লাগিয়ে দেয় আর হাসিতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে তিনজনের কেউ-ই কম যায় না। পৈতের পর ক'দিন ব্রহ্মচর্য। সে সময় অব্রাহ্মণের মুখ দেখা মানা। তাই তিনজনকে রাখা হয়েছিল দোতলার একটি ঘরে, সেই ঘরে পড়ে ছিল একটি বাঁয়া। সেই বাঁয়া তখন ছেলেদের মজা করার আরেকটি মাধ্যম হয়ে উঠল। নিচ দিয়ে যখনই তারা দেখত কোনো চাকর-বাকর চলে যাচ্ছে তখনই তারা বেশ জোরে ধপ্ ধপ্ করে বাঁয়াটা বাজাতে থাকত। আচমকা বিদ্ঘুটে আওয়াজে চাকররা ওপরে মুখ তুলে ওদের দেখতে পেয়েই অপরাধের ভয়ে মাথা নিচু করে প্রায় ছুটেই পালাত। আর তিনজনে তাই দেখে তুলত হাসির হর্‌রা।

সুখের দিন একসময় শেষ হ'ল। দণ্ডী বা ব্রহ্মচারী হয়ে ঘরে আটকে থাকার দিন শেষ হ'ল। ছাত্রবৃত্তির পাঠ শেষ করে রবি তখন পড়ে বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। ডি ক্রুজ সাহেবের এই ফিরিঙ্গি স্কুলে ইংরেজী পড়ানোটা ভাল হয় বলে রবিকে নর্মাল স্কুল থেকে এখানে এনে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

এই স্কুলে এসে রবি যেন হাঁফিয়ে ওঠে। একে শিক্ষকদের দয়ামায়াহীন হাঁকডাক, নিয়মের কড়াকড়ি—অন্যদিকে এই স্কুলের বেশিরভাগ ছেলেই ছিল ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গি ছেলেরা ছিল দুর্দান্ত। রবি নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের দেখেছে। তারা ছিল ভালমানুষ—মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে। একটু বা গ্রাম্য প্রকৃতির। কিন্তু ডিক্রুজ সাহেবের স্কুলের ব্যাপারটাই আলাদা। ছেলেরা এসেছে বেশ সম্পন্ন ঘর থেকে। তার মধ্যে বেশিরভাগ ছেলেই ফিরিঙ্গি। দেশটা শাসন করছে ফিরিঙ্গি ইংরেজ—

এই ছেলেগুলোও মনে করত তারাই বুঝি শাসন করছে ভারতবাসীদের। ফলে পারলেই তারা সাধারণ বাঙালী ছাত্রদের ওপর চালাত হামলা। সে হামলা থেকে রবিও রেহাই পায়নি। তার মনে হয়েছে ছেলেগুলো রীতিমত দুর্বৃত্ত। সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকত সে।

পৈতের পর নতুন করে ভয় ভাবনা ঢুকল রবির মনে। এই নেড়া মাথা নিয়ে স্কুলে গেলে তার ওপর যে কি অত্যাচার হবে সেকথা ভেবেই রবি আকুল। তার নেড়া মাথায় ফিরিঙ্গি ছেলেরা তবলার বোল তুলবে একথা ভাবতেই রবির চোখে জল আসত। অথচ চুল ওঠার পর স্কুলে যাবে বাড়িতে একথাটা বলার মত সাহস রবির নেই। তাই সে পড়ে মহা ভাবনায়।

রবি তখন বেশ মন দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে। সেই মন্ত্র পড়তে পড়তে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা রবি বলেছিল কিনা তা ঠিক জানা যায়নি, তবে স্কুলে যাওয়ার আগেই স্কুলে না যাওয়ার সুযোগ এসে গেল তার।

সেদিনও রবি একমনে পড়ছে গায়ত্রী মন্ত্র আর বোধহয় ভাবছে তার সমস্যার কথা। এমন সময় দরজার গোড়ায় দেখা গেল কিনু হরকরাকে। কিনু দেবেন্দ্রনাথের খাস হরকরা। মহর্ষি যখন বাড়িতে থাকতেন তখন রীতিমত বুড়ো কিনু তার তকমাওয়ালা পাগড়ি আর সাদা চাপকানটা পরে তাঁর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। মহর্ষি রা কাড়ার আগেই কিনু হাজির হত তাঁর সামনে।

সেই কিনুকে দরজায় দেখে রবি একটু ভয়ই পেয়ে যায়। কিনু এসে গম্ভীর গলায় বলল, কর্তামশায় আপনাকে ডাকছেন।

ভয়ে ভয়ে রবি গিয়ে হাজির হয় তিনতলার ঘরে। মহর্ষি তখন কি যেন একটা করছিলেন। রবিকে দেখেই বললেন, এসো। রবি ঘরে ঢোকে। মহর্ষি একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন

দেখলেন, তারপর বললেন, তুমি আমার সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যাবে ?

কথাটা যেন রবি বিশ্বাসই করতে পারে না। বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে এটা যেন আকাশের চাঁদ ধরার মত ব্যাপার তার কাছে। বাঁধভাঙা আনন্দে তার তখন চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, যাব—হ্যাঁ যাব। কিন্তু আনন্দটাকে চেপে রেখে মাথা নিচু করে রবি পা দিয়ে মেঝেতে আঁক কষতে থাকে।

তার ওই ভাব দেখেই দেবেন্দ্রনাথ যা বোঝার বুঝলেন। একটু হেসে বললেন—যাও, এবার হিমালয় যাত্রায় তুমিই হবে আমার সঙ্গী।

দেবেন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে রবির যেন এক পাক নাচতে ইচ্ছে করল। জনে জনে সবাইকে জানিয়ে দিল বাবার সঙ্গে সে এবার হিমালয় যাচ্ছে।

শুরু হয়ে গেল হিমালয়ে যাবার উদ্যোগ পর্ব। উদ্যোগপর্বই বটে। এই প্রথম রবির জন্য পোশাক তৈরি হল। ঠাকুরবাড়িতে ছেলেমেয়েদের পোশাকে কোন সময়ই কোন বাহুল্য থাকত না। এত সাধারণ ছিল তা যেটাকে রীতিমত গরিবানিই বলা যায়। এমনি সবসময় সাধারণ একটা সাদা জামা। শীতের সময় সেই জামার ওপরই আরেকটি সাদা জামা চাপান হত। দশ বছর বয়সের আগে রবির পায়ে মোজাও ওঠেনি। এরকম অবস্থায় নতুন পোশাকের জন্য দর্জি এসে মাপ নিচ্ছে এটা রীতিমত একটা উৎসবেরই ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা, সব কিছু করাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। কি রঙের, কি রকম কাপড়ে জামা হবে তাও ঠিক করে দেন মহর্ষি।

জামা কাপড় তৈরি হ'ল। যাওয়ার দিনও ঘনিয়ে এল।

সে সব দিনের কথা রবির স্পষ্ট মনে ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যাওয়ার দিন, চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির দালানে সবাইকে নিয়ে উপাসনায় বসলেন দেবেন্দ্রনাথ। উপাসনার শেষে

গুরুজনদের প্রণাম করে রবি বাবার সঙ্গে উঠল গাড়িতে। সেটাই তার প্রথম বিদেশযাত্রা।

নতুন পোশাকের সঙ্গে ছিল জরির কাজ করা মখমলের একটি টুপি। নতুন পোশাক পরতে রবির যত আনন্দ, টুপিটা পরার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই আপত্তি। নেড়া মাথায় টুপিটা বেমানান এমনই ধারণা তার। অথচ টুপি না পরাটা মহর্ষির কাছে রীতিমত সহবত বহির্ভূত একটা কাজ। তাই গাড়িতে উঠেই তিনি রবিকে বললেন, খুললে কেন, টুপিটা পরে নাও।

রবি আর কি করবে? একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে পরে ফেলল টুপিটা। রেলগাড়িতে উঠেও কয়েকবার টুপিটা খোলার চেষ্টা করেছে রবি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের চোখ এড়াতে পারেনি। তিনি শুধু বলছেন, খুললে কেন, ওটা পরে ফেল। বাবার সে নির্দেশ অবহেলা করতে পারেনি রবি।

হিমালয়ে যাবার আগে কয়েকদিন রবিদের বোলপুরে থাকার কথা। এই বোলপুরের একটা ইতিহাস আছে। রবির যখন বছর দুই বয়স সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শ'খানেক মাইল দূরে বীরভূম জেলার বোলপুর গ্রামের কিছু দূরে খাঁ-খাঁ করা এক মাঠ—লোকে যাকে বলত ভুবনডাঙার মাঠ—সেই মাঠে বিশ বিঘে জমি কেনেন। সেই জমিতেই পরে একদিন গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতন,—গড়ে তোলেন সেদিনের ছোট্ট রবি—পরবর্তী-কালের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ।

ভুবনডাঙার ওই মাঠে এক ছাতিম বা সপ্তপর্ণী গাছের তলায় বসে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম উপাসনা করে মনে পেয়েছিলেন পরম প্রশান্তি। পরে সেই জমিতেই তৈরি করেন ছোট্ট একটা কুঠি—সেই কুঠিতেই এসে উঠলেন পিতাপুত্র।

বোলপুরে আসার আগে অথবা বলা যায় বাবার সঙ্গে এই ভ্রমণে বেরোবার আগে রবির মনে ছিল বেশ কিছু ধারণা, ভয় ভাবনা। ছিল কিছু কল্পনাও। কিন্তু বাড়ি থেকে রওনা হয়ে রেলে চড়া

এবং তারপর বোলপুরে আসার পর রবি তার জানা ধারণাটার সঙ্গে সত্যিকারের জায়গা বা ঘটনাগুলোর কোন মিলই খুঁজে পেল না। আর যত মিল পেল না—ততই মনে মনে বলতে থাকল—মিথ্যুক, মিথ্যুক।

রবির এই দুর্বচন তারই ভাগ্না সত্যপ্রসাদের উদ্দেশে। আসলে আগাগোড়াই সত্যপ্রসাদ ভালমানুষের মত সহজ সরলভাবে তার কল্পনার জিনিসগুলিকে বানিয়ে বানিয়ে এমনভাবে বলে যেত যে তা বিশ্বাস না করে কোন উপায় ছিল না। রবির বোলপুরে আসার কিছুদিন আগেই সত্যপ্রসাদ বোলপুর ঘুরে গেছে। কলকাতায় ফিরে সে রবিকে যেসব গল্প করেছিল তাতেই রবির মনে দানা বেঁধে ওঠে এক ধরনের ভয় ভাবনা।

সত্য বলেছিল, রেলগাড়িতে ওঠাটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বিশেষ রকম দক্ষতা না থাকলে রেলগাড়িতে চড়া মহা সংকট—একবার পা ফসকালেই, ব্যস। আর কোনভাবে রেলগাড়িতে উঠলেই কি রেহাই আছে। গায়ের সমস্ত শক্তিকে .জড়ো করে বেশ আঁট করে বসতে হয় ট্রেনের কামরায়—নাহলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

এসব শুনে আর ট্রেনে চড়েই বোলপুর যেতে হবে জেনে রবি মনে মনে বেশ কাহিলই হয়ে পড়েছিল। একবার তার ভয়ের কথাটা বাবাকে বলবেও ভেবেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, সে ভয় পেয়েছে জেনে বাবা যদি তাকে নিয়ে না যান—তাহলে? আসলে বাইরে যাওয়ার, বাইরের পৃথিবীটাকে দেখার আগ্রহটা রবির এত বেশি ছিল যে ওইসব বিপদের ঝুঁকি সে নিয়ে ফেলেছিল বেশ সাহস করেই।

স্টেশনে এসে রবি কিন্তু দেখল বেশ সহজ সাধারণ ভাবেই বাবার সঙ্গে সে কামরায় উঠে গেল। তখনও তার মাথায় ঘুরছে সত্যর কথাটা। তাই ভাবল, আসল ট্রেনে চড়া বোধহয় বাকি আছে—এরপর বোধহয় সত্যর কথামত কায়দা করে ট্রেনে উঠতে

হবে। রবি মনে মনে তৈরি হতে থাকে—ভাবে এই বুঝি আসল ট্রেনে ওঠার ডাক পড়বে। কিন্তু সে ডাক আসার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল—এবং আরও মজার ব্যাপার বেশ আরাম করেই জানলার ধারে বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে পেঁছে যাওয়া গেল বোলপুরে। আর স্টেশনে নেমেই রবির মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল কথাটা, মিথ্যুক, মিথ্যুক।

বোলপুরে এসেও সত্যর কথামত একবারে সেই ছোট বেলার রাজার বাড়ির মত কুঠিবাড়ি থেকে রান্নাঘরে যাওয়ার সেই রাস্তাটা খুঁজতে থাকে রবি—কিন্তু যে রাস্তা নেই, তাকে খুঁজে পাওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার—এটা বুঝতে তার সময় লাগল অনেক।

সত্য তাকে বলেছিল, কুঠিবাড়ি থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত রাস্তাটার মাথায় কোন ছাউনি নেই—কিন্তু তবু গায়ে এতটুকু রোদ লাগে না। তাই হয়রান হয়ে সে খুঁজেছিল ওই রাস্তাটা। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা খুঁজে না পেয়ে রবি আবার বলেছিল, মিথ্যুক, মিথ্যুক!

সত্য আরও বলেছিল, বোলপুরে মাঠের চারিদিকে শুধু ধান আর ধান ফলে আছে। মাঠের পাশেই গরু চরায় রাখাল বালকরা। তাদের সঙ্গে রোজ যতক্ষণ খুশি খেলা যায়—কেউ আপত্তি করে না তাতে। সেসব খেলার মধ্যে যে খেলাটা রোজই খেলা হয়, তা হ'ল মাঠের ওই ধান থেকে চাল নিয়ে ভাত রেঁধে ওই মাঠে বসেই একসঙ্গে ভাগ করে তা খাওয়া।

বোলপুরে নেমে রবি তাই প্রথমেই ধানক্ষেত আর রাখাল-বালকদের দেখতে চাইল। কিন্তু সারা মাঠে দু'চারটি খেজুর আর ছাতিম জাতীয় গাছ ছাড়া তার নজরে এল না কিছুই। রাখাল-বালক হয়তো কিছু ছিল, কিন্তু রবির কল্পনার সঙ্গে তাদের চেহারার কোন মিল ছিল না। মিল ছিল না বলেই রবি তাদের খুঁজেও পায়নি। আর না পেয়ে আবারও বলেছিল, মিথ্যুক, মিথ্যুক!

তবে এসব দেখতে না পেলেও যা দেখতে পেয়েছিল তাতেই

মন ভরে গেল রবির। বিশেষ করে তার সব কাজেই বাবার উৎসাহটা তাকে নতুন করে আবার সব কিছু করার প্রেরণা দিতে থাকল। ছোটখাট বিষয়ের মধ্যেও রবি যেন খুঁজে পেতে থাকল বিশ্ব জয়ের আনন্দ।

বোলপুরের কুঠি বাড়ির দুপাশে বিরাট মাঠটা ভরে ছিল ছোট ছোট নুড়ি আর কাঁকুরে বালির ঢিবি। বর্ষার জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেসব ঢিবি ছোট ছোট পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে মাঠ জুড়ে। তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জলের ধারাগুলির কোনটিকে মনে হয় নদী, কোনটিকে বা মনে হয় উপনদী। সব মিলিয়ে মনে হয় এ যেন লিলিপুটের দেশ—তাই পাহাড়, নদী সবকিছুই ছোট ছোট—অনায়াসেই পার হওয়া যায় সবকিছু। এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলোকে ওখানে বলে খোয়াই। এই খোয়াইয়ের প্রান্তরে বেড়াতে রবির লাগত সবচেয়ে বেশি ভাল। দেবেন্দ্রনাথ কখনো ছেলের এই ভাল লাগায় বাধা দিতেন না। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, এর মধ্য দিয়েই ছেলের নতুনকে দেখার—জানার আগ্রহটা গড়ে উঠবে।

বাবার এই প্রশ্রয়ে রবির দিন রাত্তিরগুলি যেন হারিয়ে যেত খোয়াইয়ের প্রান্তরে। আপন মনে একা একা ঘুরে বেড়াত সে ওই প্রান্তরে। দু'চোখ ভরা বিস্ময়ে সব কিছুকে দেখত, ভরিয়ে তুলত তার মনের পাত্র।

শুধু দেখা নয়, খোয়াই থেকে রবি সংগ্রহ করে নিয়ে আসত নানা ধরনের নুড়ি পাথর। আঁজলা ভরে বাবার সামনে তুলে ধরে বলত, দেখুন কেমন পাথর এনেছি !

মহর্ষিও ছোট ছেলেটির উৎসাহ নষ্ট না করার জন্যই উৎসুক হয়ে বলতেন, কই দেখি। তারপর সে পাথর হাতে নিয়ে বলতেন, কি চমৎকার, এ সমস্ত তুমি কোথায় পেলে ?

এমন আরো কত আছে ; কত হাজার হাজার। আমি রোজ এনে দিতে পারি।

তাহলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়ে আমার পাহাড়টা তুমি সাজিয়ে দাও।

মহর্ষির ওই পাহাড়টার আবার একটা ইতিহাস আছে। কুঠির ধারেই একবার একটা পুকুর কাটার চেষ্টা হয়েছিল। বহু মাটি খোঁড়ার পরও কোন জল না পেয়ে পুকুরের কাজ বন্ধ রাখা হয়। সেই পুকুর কাটা মাটিগুলিই একদিকে জমা করে রাখা হয়েছিল পাহাড়ের মত ঢিবি করে। সেই পাহাড়কেই পাথর দিয়ে সাজাবার কথা বলেন দেবেন্দ্রনাথ।

বাবার উৎসাহে রবি রোজ পাথর এনে রাখত সেই মাটির পাহাড়ে। শেষ পর্যন্ত, সে পাহাড় আর হয়ে ওঠেনি—কিন্তু ওরি মধ্য দিয়ে—নিজে যে একটা কিছু করতে পারি—এই আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠেছিল রবি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথেরও ছিল সেটাই নীতি। তাঁর মতে কোন সময়েই ছোটদের কোন কাজে উৎসাহের অভাবটা দেখাতে নেই—বরং উৎসাহ দেখালে ছোটরা সব বিষয়েই অনেক সচেতন—অনেক সতর্ক হয়ে ওঠে—তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা আত্মসচেতন ভাব। বাবার এই শিক্ষাটা পরবর্তী কালে কাজে লাগান রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে।

সেবারে শান্তিনিকেতনে সেই প্রথম থাকার সময় রবির ছোট্ট হৃদয়টা বারে বারেই নতুন নতুন আবিষ্কারের আনন্দে ঝরনার মতই কলকলিয়ে উঠত—আর সব সময়ই তার আবিষ্কারের প্রথম খবরটি দেবার জন্য সে ছুটে আসত তার বাবার কাছে।

খোয়াইয়ের মধ্যে একজায়গায় একটা গভীর গর্তের মধ্যে মাটি চুইয়ে এসে জমা হয়েছিল জল। গর্তের সেই জল উপচে উঠে ঝরনার মতই তির তির করে বয়ে যাচ্ছিল বালির ওপর দিয়ে। সেই ঝিরঝিরে জলধারা দেখে রবির কি আনন্দ। সে ছুটতে ছুটতে এসে বলে, বাবা, বাবা, একটা জিনিস দেখেছি।

কি ?

খোয়াইয়ের মধ্যে ভারি সুন্দর—পরিষ্কার একটা জলের ঝরনা দেখেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবা, সেখান থেকে আমাদের নাওয়া খাওয়ার জল আনলে বেশ হয়।

ছেলের উৎসাহের সঙ্গে নিজের উৎসাহ মিশিয়ে মহর্ষিও সেই রকমই উচ্ছল গলায় বলেন, সত্যি বেশ হয়।

বাবার কথায় রবির মনে হয়, সে বুঝি লিভিংস্টোনের মতই অন্ধকার আফ্রিকার একটা অঞ্চল আবিষ্কার করেছে। সেই আবিষ্কারের আনন্দে মগ্ন হয় রবি। আর সে আনন্দ যাতে ভেঙে না যায় তার জন্য মহর্ষি সেই ঝরনা থেকেই জল আনানোর ব্যবস্থা করলেন।

এমনিভাবে বাবা আর ছেলেতে মিলে শান্তিনিকেতনে মেতে উঠলেন এক নতুন খেলায়। প্রায় স্বাধীন রবির চিত্ত নতুন নতুন দেখা আর জানার আনন্দে বারেবারেই রঙিন হয়ে ওঠে আর মহর্ষি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানুষকে সম্পূর্ণ করার জন্য নিজের ক্ষতি মেনে নিয়েও মেতে রইলেন একটার পর একটা কাজে।

মহর্ষির একটা সোনার ঘড়ি ছিল। বড় প্রিয় সেটা তাঁর। রবিও জানত। তাই মাঝে মাঝে ঘড়িটা নেবার জন্য চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠলেও রবি কোনদিনই হাত বাড়ায়নি সেদিকে। কিন্তু মহর্ষির একদিন হঠাৎই খেয়াল হ'ল ব্যাপারটা। মনে হয়, ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। দরকারি জিনিস ছোটদের কাছ থেকে দূরে না রেখে তাদেরই সে জিনিসটি আগলাবার ভার দিলে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে একটা দায়িত্ববোধ—সে দায়িত্ববোধই তাদের পরিণত করবে আগামী দিনের সচেতন মানুষে।

যেমন মনে হওয়া তেমনি কাজ। রবিকে ডেকে দেবেন্দ্রনাথ বললেন, আজ থেকে তুমি আমার এই ঘড়িটায় দম দেবে।

কথাটা যেন রবি বিশ্বাস করতে পারে না। বাবা নিজে বলছেন তাঁর ওই প্রিয় ঘড়িটায় দম দিতে—এটা যেন তার বিশ্বাস হয় না। তাই একটু ভয়ে ভয়েই বলে, আমি ?

হ্যাঁ, কেন পারবে না তুমি ?

রবি মাথা নিচু করেই বলে, হ্যাঁ, পারব।

বেশ। তাহলে রাখ ঘড়িটা। তুমিই ঠিক ঠিক দম দিও এতে। রবি দুহাত বাড়িয়ে নেয় ঘড়িটাকে। পরম কৌতূহলে তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে চলে যায় বাবার সামনে থেকে। পরম মমতায় মহর্ষির হৃদয়খানা হয়ে ওঠে সকালের রোদ লাগা ঘাসের মতই নরম—চকচকে।

রবি বেশ যত্ন করেই ঘড়িতে দম দিত। যন্ত্রটা যে সে একটু বেশিমাত্রায় নিচ্ছে তা টের পাওয়া গেল দিন কয়েক বাদেই। অত দামি ঘড়িটার স্প্রিংটাই গেল কেটে। ভয়ে ভয়ে রবি এসে বলে, বাবা, ঘড়িটার যেন কি হয়েছে, যত দম দিচ্ছি ততই দম খাচ্ছে, কিছুতেই আর দম দেওয়া শেষ হচ্ছে না।

রবির ওই কথাতেই মহর্ষি বুঝলেন ব্যাপারটা। তবু বললেন, কই দাও ঘড়িটা। ঘড়িটা নিয়ে একটা পাক দিতেই বুঝলেন, স্প্রিংটা কেটে গেছে। রবিকে বললেনও সেকথা। বললেন, ঘড়িতে পাক গুনে গুনে দম দিতে হয়। কোনরকম বকাঝকা না করেই সেবার তিনি ঘড়িটাকে কলকাতায় পাঠালেন মেরামতির জন্য। আর রবিও বুঝল, কোন কাজ করব বললেই করা যায় না। তা করতে হয় অনেক বুঝেসুঝে, অনেক ভেবেচিন্তে।

মহর্ষির পরীক্ষার কিন্তু শেষ হয় না। রোজ রবির কাছে দু'-চার আনা পয়সা রেখে দিতেন তিনি। তারপর সকালে বেড়াবার সময় ভিখারি দেখলেই বলতেন, ভিক্ষে দাও। তারপরই বলতেন, কত খরচ হয় মনে রেখ কিন্তু, সন্ধ্যেবেলায় হিসেব দেবে তুমি আমাকে।

সন্ধ্যেবেলায় হিসেব দেবার সময় প্রায়ই দেখা যেত হিসেব আর

মেলে না কিছুতেই। একদিন তো তহবিলই গেছে বেড়ে। ব্যাপার দেখে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, তোমাকেই দেখি আমার জমিদারির ক্যাশিয়ার করতে হবে। তোমার হাতে দেখছি টাকা বেশ বেড়ে যায়।

এমনি নানা ঘটনা আর আনন্দের মধ্যে বেশ দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। শান্তিনিকেতনে একটা নারকেল গাছের তলায় ছোট্ট কবি রবি দু'পা ছড়িয়ে বসে পড়ত তার কবিতার খাতাখানা নিয়ে। তারপর চারদিকে যা দেখেছে—তাকেই রূপ দিত কবিতায়। আঁচড়ের পর আঁচড় কেটে ভরিয়ে তুলত খাতাখানা। তার মনের বিচিত্র সব ভাবনার সাক্ষী হয়ে খাতার সাদা প্যাতাগুলো হয়ে উঠত শব্দ মুখর।

শান্তিনিকেতনের সেই আনন্দের আসরে একদিন ইতি পড়ল। এবার যাত্রা হিমালয়ের দিকে। বোলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে রবি এসে পেঁছিল অমৃতসরে। এই ট্রেনে আসার সময়ও ঘটল একটা মজার ঘটনা।

ট্রেন এসে থেমেছে একটা বড় স্টেশনে। রবিকে নিয়ে তার বাবা যে কামরায় রয়েছেন সেই কামরায় উঠলেন টিকিট পরীক্ষক। টিকিট দেখে তাঁর বোধ হয় যেন একটু সন্দেহ হ'ল। রবির জন্য কেনা হয়েছিল ছোটদের টিকিট বা হাফটিকিট। রবির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে কোন কথা না বলে কেমন একটা সন্দেহভরা মন নিয়ে টিকিট পরীক্ষকটি নেমে গেলেন। মহর্ষি ব্যাপারটা তেমন করে খেয়াল করেননি বলে, টিকিট পরীক্ষককে কিছু আর জিজ্ঞেস করেননি।

একটু বাদেই সেই টিকিট পরীক্ষকটি এলেন আরো একজনকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথম শ্রেণীর সেই কামরার দরজা থেকেই তাঁরা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকলেন—কিন্তু কোন কথা বললেন না। একটু বাদে এলেন স্টেশন মাস্টার। তিনি রবির বাড়বাড়ন্ত গড়ন দেখে সোজাসুজি মহর্ষিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির কি বার

বছরের বেশি বয়স নয় ?

মহর্ষি বললেন, না।

স্টেশনমাস্টারের কিন্তু মহর্ষির কথা বিশ্বাস হ'ল না। তাই আরেকবার রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, না, এ ছেলের বয়স বারোর চেয়ে বেশি। এর জন্য পুরো ভাড়া দিতে হবে।

গায়ে গরম তেলের ছিটে লাগলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে তেমনই চমকে উঠলেন মহর্ষি। পয়সা বাঁচাবার জন্য তিনি মিথ্যে বলছেন—রেলকর্মীদের মনে এই সন্দেহ দেখা দেওয়ায় জ্বলে উঠল তাঁর চোখ দু'টি। আর একটি কথা না বলেও তিনি বাক্স থেকে একটি নোট বাড়িয়ে দিলেন। ভাড়ার টাকা কেটে রসিদ লিখে টিকিট পরীক্ষকটি বললেন, এই নিন বাকি টাকাটা।

দেবেন্দ্রনাথ সেই টাকাটা নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে প্ল্যাটফর্মের ওপর। সেই মুহূর্তে তাঁর দীপ্ত দু'টি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে স্টেশনমাস্টারটিও কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন। যে ব্যক্তি হেলায় অতগুলি টাকা ফেলে দিতে পারেন তিনি যে পয়সা বাঁচাবার জন্য মিথ্যে বলবেন না একথা বুঝতে পারলেন স্টেশনমাস্টার। মিথ্যে সন্দেহ করার নীচতার দায় মাথায় নিয়ে নীরবেই তিনি চলে গেলেন কামরা থেকে।

বাবার সঙ্গে রবি এল অমৃতসরে। অমৃতসরে তাঁরা ছিলেন মাসখানেক। ওখানকার দু'টি ঘটনার কথা রবি কোনদিন ভুলতে পারেনি। একটা স্বপ্নের মতই তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্বর্ণমন্দিরের ছবি। গুরু সরোবরের মধ্যে দরবার সাহিবে অবিরত চলছে গুরুগ্রন্থ পাঠ—চলছে কীর্তন—ভজন। রবি সকালবেলা বাবার সঙ্গে গেছে সেখানে। মহর্ষি সেই শিখ ভক্তদের সঙ্গে বসে হঠাৎ-ই সুর করে শুরু করে দিলেন তাঁদের প্রার্থনা। একজন বিদেশীকে তাঁদের প্রার্থনা করতে দেখে তাঁদের যেমন হ'ল বিস্ময়—তেমনি বেড়ে গেল ভজনের উৎসাহ। তাঁরা আরো জোরে—আরো আন্তরিকভাবে গাইতে থাকেন গান।

ফেরার সময় দু'হাত ভরে দিলেন হালুয়া আর মিছরির টুকরো।

পরের ঘটনাটি কিন্তু বেশ মজার। গানের প্রতি মহর্ষির ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাই একদিন গুরু দরবারের একজনকে বাড়ি নিয়ে এলেন গান শোনবার জন্য। গানের শেষে তিনি গায়ককে যে টাকাটা দিলেন তা ছিল পাওনার চেয়ে অনেক বেশি। গান শুনে কেউ যে ওই টাকা দিতে পারে—এটা ছিল তার ধারণারও বাইরে। এই টাকা দেওয়ার ফলটা হ'ল অন্যরকম। গায়কটি ফিরে গিয়ে তার পাওনার কথা এমন সুরে প্রচার করতে থাকে যে পরদিন থেকে প্রায় দলে দলে গায়ক আসতে থাকে গান শোনাবার জন্য। বেগতিক থেকে মহর্ষি বাড়ির দরজায় কড়া পাহারা বসালেন। ঘরে এসে আর কেউ গান শোনাতে পারে না। মহর্ষি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

কিন্তু এই স্বস্তি যে কত অল্প সময়ের তা টের পেলেন রাস্তায় বেরিয়েই। ঘরে পাহারা আছে কিন্তু সরকারি রাস্তায় কে আর তাদের গতিরোধ করবে। তারা রাস্তাতেই গান শোনাতে আরম্ভ করে। রবিদের অবস্থাটা দাঁড়াল জলাতঙ্ক রোগীর মত। জলাতঙ্ক রোগী যেমন জল দেখলে ভয় পায়—তাঁরাও তেমনি দূর থেকে কোন তানপুরা দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠতেন—এই বুঝি গান শুনতে হবে। গান তাদের কাছে তখন রীতিমত ইংরেজি গান (GUN) হয়ে উঠল।

অমৃতসর থেকে তাঁরা আসেন ডালহৌসি পাহাড়ে। বেড়াতে এসেও পড়াশোনার হাত থেকে কিন্তু রবি রেহাই পায়নি। তবে ভরসা, এখানে মাস্টারমশাইদের চোখ রাঙানি নেই, পড়া না পারলে ঠাট্টা বিদ্রূপও নেই। এখানে রবির পড়ার ভারটা নিয়েছিলেন মহর্ষি স্বয়ং। তিনি যেমন নানা বই পড়াতেন তেমনি পড়ার বাইরে নানা গল্পও শোনাতেন তাকে। সেসব গল্পের মধ্যে যেমন ছিল নানা বিদেশী গল্প, বড়—মহৎ মানুষদের জীবনের কাহিনী তেমনি ছিল বাঙালীর বাবুয়ানা, বাঙালীর বিলাসিতার কথাও।

বাবার কাছেই রবি প্রথম শোনে—সেকালের বাবুরা এমনই বিলাসী, এমনই ননীর পুতুল ছিলেন যে ঢাকাই ধুতির পাড়ও তাঁদের ভারি লাগত—সেই পাড় তাঁদের গায়ে যেন আঁচড় কাটত। তাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে তাঁরা সেসব কাপড় পরতেন।

গল্প বলছেন মহর্ষি। অবাক হয়ে শুনছে রবি। খেতে বসে বাবু দেখলেন, দুধটা একটু জোলো। বুঝলেন গয়লা দুধে জল মিশিয়েছে। গয়লা যাতে জল মেশাতে না পারে তা দেখার জন্য তিনি একজন ভৃত্যকে নিযুক্ত করলেন। তারপরও দুধের অবস্থা একইরকম, তাই ভৃত্যের ওপর নজর রাখার জন্য রাখা হ'ল আরেকজনকে, তার ওপর নজর রাখতে আরেকজন—এইভাবে নজরদারের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল দুধের রঙও ততই ঘোলা হতে হতে একবারে জলের মত নীল হয়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে বাবু এবার গয়লাকে ধমকে বললেন, ভেবেছ কি, এটা দুধ!

ধমক খেয়ে গয়লা নির্বিকার মুখে বলে, আমি কি করব? এখন তো তবু পরিষ্কার জল পাচ্ছেন, নজরদার আরো বাড়লে দুধের সঙ্গে গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক, চিংড়ি মাছও পাওয়া যেতে পারে।

গয়লার একথা শোনার পর বাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। নজরদারদের চাকরি গেল দুধও হ'ল আগের মত।

এইরকম মজার মজার গল্পের সঙ্গে পড়াশোনাটাও যে বেশ জবররকম হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পড়ার পাঠ শুরু হ'ত সেই ভোরে—সূর্য তখনও পাটে বসেনি। পূব আকাশে সবে লেগেছে হয়ত একটু লাল আভা—এমন সময় মহর্ষি ঘুম থেকে তুলে দিতেন ছোট্ট রবিকে। শুরু হ'ত তার উপক্রমণিকা থেকে নরঃ নরৌ নরাঃ শব্দরূপ মুখস্থ করা। রবির নিজের কথায় 'শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।'

সূর্যোদয়ের সময় মহর্ষি উপাসনার শেষে একবাটি দুধ খেয়ে

রবিকে নিয়ে আবার উপনিষদের মন্ত্র আউড়ে উপাসনা করতেন। তারপর বেড়ানো। মহর্ষি নিজে যেমন রবিকে নিয়ে বেড়াতেন তেমন তাকে একা একাও পাহাড়ে বেড়াতে দিতেন।

বেড়ানোর মধ্যে মধ্যে তো পড়া নিয়ে আলোচনা চলতই, বাড়িতে এসেও পড়তে হত রীতিমত নিয়ম করে। ইংরেজি পড়াবার জন্য মহর্ষি 'পিটার পার্লেস টেলস' পর্যায়ের অনেকগুলো বই এনেছিলেন। তার থেকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী পড়াতে গিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সংসারী ব্যাপার-স্যাপার থেকে মহর্ষি রীতিমত বিরক্ত হয়ে বই ছেড়ে রবিকে অন্য বিষয় পড়ান। প্রক্টরের সহজ সরল ইংরেজিতে লেখা জ্যোতিষের বই থেকে অনেক বিষয় তিনি মুখে মুখে বুঝিয়ে দিতেন এবং রবিকে সেসব আবার বাংলায় লিখতে হ'ত।

সংস্কৃত উপক্রমণিকা ছাড়া ঋজুপাঠ দ্বিতীয় পাঠ পড়াতে থাকলেন। পরে এই ঋজুপাঠের বিদ্যেই মা'র কাছে প্রকাশ করে রবি তাঁকে একবারে অবাক করে দিয়েছিল। সংস্কৃত, ইংরেজি ছাড়া বাংলা পড়াও চলত তার।

মহর্ষি ছেলেকে যেমন পড়াতেন, তেমনি নিজেও পড়তেন। নিজের পড়ার জন্য তিনি যেসব বই এনেছিলেন তার মধ্যে ছিল দশ বারো খণ্ডে বাঁধানো মোটা মোটা গিবনের রোম। সেই বইগুলি দেখে রবি ভাবত, আমি ছেলেমানুষ, না পড়ে উপায় নেই বলেই আমাকে দায়ে পড়ে এসব বই পড়তে হয়। কিন্তু বাবা তো বড়। তিনি তো ইচ্ছে করলেই এসব নাও পড়তে পারেন—তবে সাধ করে কেন তাঁর এই বই পড়ার দুঃখকে বরণ করা? সেসময় রবি এর উত্তর পায়নি সত্যি, কিন্তু বড় হয়ে নিজে যখন অসংখ্য বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন তখন বোধহয় বুঝেছেন এই 'দুঃখ'টায় সুখ কোথায়।

এই হিমালয়ে বেড়াতে এসে রবি খোলা মনে খোলা চোখে সবকিছু দেখার—জানার ব্যাপারটা জানল, জানল সেই জানা নিয়ে

ভাবতে এবং সেই ভাবনাকে লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে। কয়েক মাস বাদে রবি তার বাবার সহচর কিশোরী চাটুজ্জ্যের সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়। কিন্তু ওই ক'মাসে যা নিয়ে এল তা হয়ে রইল তার সারাজীবনের দুর্লভতম সঞ্চয়।

॥ ৬ ॥

স্কুলে পড়লেও প্রায় প্রথম থেকেই রবির পড়ার ধারাটা ছিল একটু অন্যরকম। বয়সের তুলনায় অনেক আগেই শুরু হয়েছিল তার পড়ার পাট, আবার বয়সের চেয়ে অনেক আগেই শেষ হয়েছিল স্কুলে যাওয়া। স্কুলের পড়া বন্ধ হলেও শিক্ষা কিন্তু থেমে থাকেনি। বাড়িতেই তার জন্য বিশেষভাবে হয়েছিল শিক্ষার নানা আয়োজন।

রবির ঠিক ওপরের ভাই সোম আর ভাগ্না সত্য যখন পড়া শুরু করে তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় রবির পড়া। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আর বোধোদয় দিয়ে তার শিক্ষার শুরু। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তার মনে প্রথম তোলে ছন্দের সুর— আনে মোহ।

সোম আর সত্য রবির চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। তাই তাদের যখন স্কুলে ভর্তি করা হ'ল তখন রবিকে ভর্তি করার কথাটা ওঠেই না। কিন্তু গোল বাধাল রবি নিজেই। এতদিন তিনজনে একসঙ্গে বই নাড়াচাড়া করেছে আর এখন দাদা আর ভাগ্না যাবে স্কুলে আর সে বসে থাকবে ঘরে এটা সে কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। পারে না বলেই বায়না ধরে, তাকেও স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে।

বাড়ির সবাই তাকে বোঝায়, ওরে, ওরা যে তোর চেয়ে দু বছরের বড়। ওদের তো আগে স্কুলে ভর্তি করতেই হবে। তুই আর কিছুদিন বাড়িতে পড়, তারপর তোকেও ভর্তি করে দেব স্কুলে।

সে কথায় ভোলার ছেলে রবি নয়। তার এক কথা, ওরা যখন স্কুলে যাবে তখন তাকেও স্কুলে পাঠাতে হবে। শুধু কথায় যখন কাজ হ'ল না, তখন কান্না জুড়ে দিল রবি 'আমি স্কুলে যাব' বলে।

বাড়িতে তখন রবিদের পড়াতেন মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার লোক। তাঁরই কাছে একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল তিনজনের বিদ্যারম্ভ। তিনিও যখন রবিকে কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না তখন রেগে রবিকে একটি চড় মেরে বিশুদ্ধ বাঁকুড়ার ভাষায় বললেন, এখন যেমন স্কুলে যাবার জন্য কাঁদছ; পরে না যাবার জন্য কাঁদতে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি।

অনেক বড় হয়ে এই ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনদিন কর্ণগোচর হয়নি।' সত্যি সত্যি—এই কথাটির মত আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী বোধহয় তাঁর জীবনে আর একটিও মেলে নি।

যাই হোক, কান্নার জোরে রবি তার দাদা আর ভাগ্নার সঙ্গে ভর্তি হল স্কুলে। স্কুলটা প্রাচীনকালের মত পাঠশালা নয়—রীতিমত ইংরেজি আদবকায়দার স্কুল। নাম ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। ১৮২৩ সালে গৌরমোহন আঢ্য মাত্র ১৮ বছর বয়সে খুলেছিলেন এই ইংরেজি পাঠশালাটি। ইংরেজি স্কুল—কিন্তু আদর্শ এই পাঠশালাটি সেকালের বিশিষ্ট হিন্দু বিশেষ করে ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ঠাকুরবাড়ির বেশিরভাগ ছেলেরই পড়া শুরু এই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। পড়া যা হত তার চেয়েও শাস্তির ভয়টাই মনে চেপে বসত বেশি। পড়া না পারলেই সেখানে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে প্রসারিত হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত একগাদা স্লেট। ওই ভয়েই তাই কুঁকড়ে থাকত সবাই।

মাধব মাস্টার মশাইয়ের কথা সত্যি হ'ল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে খুব বেশি দিন পড়া হল না রবির। স্কুল থেকে ছুটি পেয়ে আবার সেই বাড়িতে পড়া।

রবির বয়স যখন সাত আট তখন তাকে ভর্তি করা হ'ল নর্মাল স্কুলে। স্কুলটা ছিল অনেকটা এখনকার বেসিক ট্রেনিং স্কুলের মত। মাস্টারমশাইদের হাতে কলমে শেখানোর এই স্কুলটির সঙ্গেই ছিল একটি মডেল স্কুল—সেখানে ভর্তি হ'ল রবি।

রীতিমত বিলিতি ধাঁচে চলত সেখানকার পড়া। ছাত্ররাও ছিল বয়সে রবির চেয়ে অনেক বড় তার ওপর হরনাথ পণ্ডিতের কুৎসিত ভাষায় কান গরম হয়ে উঠত রবির। তাই তাঁর ক্লাসে রবি বসে থাকত সবার পেছনে, উত্তর দিত না একটি কথারও। এই হরনাথ পণ্ডিতের কথা আজীবন মনে ছিল রবির। এই মনে থাকারই প্রতিফলন রয়েছে 'গিন্নি' গল্পে।

ক্লাসের ছেলেরাও ঠিক সহ্য করতে পারত না রবিকে। অবশ্য শুধু রবি নয়, ঠাকুরবাড়ির কোন ছেলেকেই তারা তেমন ভালভাবে নিতে পারত না। তাদের অভিযোগ, ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা অত ভদ্র কেন? কেন তারা পাজামা চাপকান পরে আসে, কেন চাকরের সঙ্গে আসে ইত্যাদি। তাই সুযোগ পেলেই তারা কোন না কোন মতে হয়রান করার চেষ্টা করত রবিকে।

এমনি করেই অবশ্য কেটে গেল একটা বছর। বাৎসরিক পরীক্ষায় বসল রবি। বাংলা পরীক্ষা নিলেন মধুসূদন বাচস্পতি। সে পরীক্ষায় প্রথম হ'ল রবি। কিন্তু তার শ্রেণীশিক্ষক অভিযোগ করলেন, রবি কখনই অত নম্বর পেতে পারে না। পণ্ডিতমশাই রবিকে বেশি বেশি নম্বর দিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে স্কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট-এর সামনে আবার পরীক্ষা দিতে হ'ল রবিকে। এবারও প্রথম হ'ল সেই।

এই নর্মাল স্কুলে প্রত্যেকটি ছেলেকে ক্লাস শুরুর আগে একটা ইংরেজি গান সুর করে গাইতে হত। কর্তৃপক্ষের ধারণা, ছেলেদের গান ভাল লাগবে, পড়ায় মন বসবে। কিন্তু সে গান ছেলেদের ভাল লাগত না মোটেই। তাই গানের কথা ওলট-পালট হয়ে সুরের মধ্য দিয়ে শোনা যেত অদ্ভুত কিছু শব্দ।

এই গানের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'-তে। বলেছেন—সে গানের সব কথা তাঁর মনে নেই। "কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।' অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু 'কলোকী' কথাটি যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা বোধহয় 'Full of glee, Singing merrily, merrily merrily'."

নর্মাল স্কুলে পড়াশোনাটা যেমনই হোক, বাড়িতে কিন্তু চলত রবিদের সবরকম বিষয়েই চৌখস করার চেষ্টা। দেবেন্দ্রনাথ নিজে চাইতেন, ছেলেরা সব বিষয়কে জানুক, শরীরটাকেও তৈরি রাখুক। সুস্থ শরীর, উদার মন আর নানা বিষয়ে জ্ঞানই একজনকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে এটা ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু নানা কাজে বছরের বেশিরভাগ সময়টাই কাটাতেন বাইরে বাইরে। তাই তাঁর মনের ইচ্ছেটাকে নিজে কাজে পরিণত করতে পারেননি কোনদিনই।

নিজে না পারলেও তাঁর এই ইচ্ছেটা তিনি খুব সহজেই সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন তাঁর বড় ছেলেদের মনে। বিশেষ করে রবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। রবির চেয়ে তিনি ১৭ বছরের বড়। ছোট ভাই ও পরিজনদের শিক্ষা দেবার অধিকারটি তিনি অর্জন করেছিলেন এই বয়স আর তার স্বভাববোধ থেকেই। বাবার মত হেমেন্দ্রনাথও চাইতেন ছোটদের সব বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে। শুধু পড়াশোনা নয়। শরীরটাও যাতে মজবুত থাকে সেদিকেও ছিল তাঁর কড়া নজর।

সেজদা হেমেন্দ্রনাথ ছোটভাইদের পড়ার যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন তার বহরটা বোঝা যাবে সারাদিনের রুটিনের দিকে তাকালেই।

ঘুম থেকে রবিকে উঠতে হ'ত রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই। বাড়ির গায়েই কুস্তির আখড়া। সেখানে কুস্তি

লড়তে এবং শেখাতে আসত হীরা সিং। একটা চোখ তার কানা। ভোরের আবছা আলোতে একটা লেংটি পরে এই কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হ'ত রবিকে ঘণ্টাখানেক।

সকালবেলায় এই মাটি-কাদা মেখে কুস্তি লড়াটা কিন্তু রবির মা একদম পছন্দ করতেন না। তাঁর ভয় হত, এইভাবে মাটি মাখলে ছেলের গায়ের রঙ কালো হয়ে যাবে। কিন্তু যাঁরা এই স্বাস্থ্যচর্চার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা আমল দিতেন না মা'র ওই আশংকাকে। বাধ্য হয়ে সারদাদেবী নিজের ছেলের গায়ের রঙ ঠিক রাখার কাজে লেগে যেতেন।

সারদাদেবী নিজেই বাদাম, সর, কমলালেবুর খোসা এই রকম আরও কত কি বেটে তৈরি করতেন একরকম মলম। ছুটির দিন সকালবেলায় ওই মলম দিয়ে শুরু করে দিতেন তিনি ছেলের রঙ শোধন কর্মকাণ্ড। অনেকক্ষণ ধরে সেই মলম দিয়ে চলত দলাই-মলাই। ছুটির সকালে এমন আটকা থাকতে রবির মন চাইত না মোটেই, কিন্তু মা'র হাত থেকে রেহাই মিলত না সহজে।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের গায়ের রঙ এমনিতেই ফর্সা ধবধবে। তার ওপর ওইসব প্রসাধন পরিচর্যার ফলে তাতে দেখা দিত অন্য ধরনের জেল্লা। এই জন্যই বাইরে একটা গুজব ছিল, ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্মের পরই ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের গামলায়। তাই তাদের রঙে এমন লালচে সাহেবি জেল্লা।

রঙের কথা থাক। বরং রবির পড়ার কথাই শোনো। ঠাকুর বাড়িতে সেই সেকালেও ছোটদের বাড়িতে পড়াবার জন্য নিয়মিত ভাবে আসতেন মাস্টারমশাইরা। রবির এমনই এক মাস্টারমশাই আসতেন নর্মাল স্কুল থেকে। নাম তাঁর নীলকমল ঘোষাল। শরীরটা রোগা ছিপছিপে কিন্তু গলার আওয়াজটা তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে রবির প্রায়ই মনে হত একটা জীবন্ত বেত বোধহয় পড়াচ্ছেন।

নীলকমলবাবু পড়াতে আসতেন সকাল ছটায়। সাড়ে ন'টায়

তিনি ছুটি দিতেন রবিকে। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র 'মেঘনাদ বধ' পর্যন্ত সবকিছুই পড়াতেন তিনি।

নীলকমলবাবু চলে যেতেই খাওয়াদাওয়া করে বাড়ির ভৃত্য শ্যাম কিংবা অন্য কারো সঙ্গে স্কুলে যাওয়া। স্কুল থেকে আসার পরও ঘুরতে থাকত শিক্ষার চাকাটা। ড্রয়িং আর জিমন্যাস্টিক শেখাতে আসতেন একজন। সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হত তাঁর শিক্ষা-দান। ততক্ষণে এসে গেছেন অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু রোজ আসতেন রবিদের পড়াতে। নিজের কাজে তাঁর ছিল না এতটুকু ফাঁকি, অথচ রবি চাইত তিনি মাঝে মাঝে কামাই করুন—পড়াটা বন্ধ থাক। কিন্তু রবির এই চাওয়াটা একবার ছাড়া কোনবারই পূরণ হয়নি। পূরণ না হওয়ার কারণ অঘোরবাবুর স্বাস্থ্য।

রীতিমত ভাল স্বাস্থ্য ছিল অঘোরবাবুর। তাই জলঝড়ের মধ্যেও তিনি চলে আসতেন পড়াতে। কামাই তিনি করেছিলেন মাত্র একবার। সেবার মেডিকেল কলেজে ভারতীয় আর ফিরিঙ্গি ছাত্রদের মধ্যে বেশ বড় ধরনের মারপিট হয়। মারপিটের সময় ফিরিঙ্গিরা কেমন করে যেন একটা চৌকি সোজা ফেলে দেয় অঘোর-বাবুর মাথায়। আহত অঘোরবাবু বাধ্য হয়ে কামাই করেন কয়েকদিন।

অঘোরবাবু ইংরেজি পড়াটাকে সরস করার জন্য নানা রকম চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। কিন্তু সন্ধ্যের সেই ঘুম জোড়া চোখে সেই চেষ্টাকে রবির মনে হত অত্যাচার। ইংরেজিটা রীতিমত ভাল ভাষা তা বোঝাবার জন্য অঘোরবাবু একবার খানিকটা অংশ আবৃত্তি করে শোনাতে থাকেন। কিন্তু তাঁর নবীন ছাত্রটির এতে এত হাসি পায় যে তিনি বাধ্য হন আবৃত্তি থামাতে।

পড়াটাকে সরস করার জন্য পাঠ্য বিষয়ের নানা বিষয় তুলে ছাত্রটির মন জয় করার চেষ্টা করতেন অঘোরবাবু।

কিন্তু রবির মন জয় করা তখন ছিল ভারি কষ্টকর ব্যাপার। তাই রবির ওই বয়সে অঘোরবাবু ছিলেন তার কাছে রীতিমত একটা ভয়ঙ্কর মানুষ।

অঘোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সেই সূত্রে কলেজে যেসব মজার মজার ঘটনা ঘটত কিংবা নতুন যে জিনিস জানতেন তা বেশ ফলাও করে বলতেন ছাত্রদের কাছে। সেদিন তিনি কলেজ থেকে কাগজে মুড়ে নিয়ে এলেন মানুষের একটা কণ্ঠনালী। তারপর পড়াটাকে সজীব করতে সেই কণ্ঠনালী বের করে বোঝাতে থাকলেন কেমন করে মানুষ কথা বলে।

ব্যাপারটা কিন্তু রবির কাছে অত মজার লাগল না। গোটা মানুষটা কথা বলে—সবার মত এটাই ছিল রবির ধারণা। কণ্ঠনালীর রূপ ও গঠন বর্ণনা করে তা ভেঙে দেওয়াটা রবির কাছে তেমন প্রীতিদায়ক হয়নি—তাই ইংরেজি পড়া তার কাছে নীরস বিভীষিকা থেকে যায় আগের মতই।

প্যারিচরণ সরকারের ইংরেজি বইয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঠ কোনমতে শেষ করতেই রবিকে মকলকস কোর্স অব রিডিং শ্রেণীর একখানা বই পড়ানো শুরু করেন। সেই মোটা বইটি দেখে রবি ভাবত, আগুন আবিষ্কার মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বলে দাবি করে সবাই—কিন্তু আলো জ্বালতে না শিখেও পাখির বাচ্চারা তেমন খারাপ কিছু হয়নি—অন্তত তারা পড়ার হাত থেকে তো রেহাই পেয়েছে—যা কিছু শেখার সব শেখে সকাল বেলাই। তবে মানুষের বেলায় অন্যরকম কেন? যাই হোক রাত নটায় ছুটি দিতেন অঘোরবাবু। শেষ হত রবির পড়ার পর্ব।

নানা কারণেই রবিবারটা ছিল রবির কাছে খুব প্রিয়। তার নামের সঙ্গে মিল আছে বলে নয়, ওইদিন বাঁধা জীবন থেকে যে একটুখানি মুক্তি পাওয়া যেত, সেদিনের রুটিনটা যে আর সব দিনের মত নয়—এটাই ছিল তার আনন্দের কারণ। তবে এই আনন্দের রবিবারটাও রবির কাছে পানসে লাগত সীতারাম ঘোষ না

এলে। রবিবার সকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শেখার সময়ও রবি উশখুশ করত সীতারাম ঘোষের জন্য।

সীতারাম ঘোষও কিন্তু আসতেন রবিকে পড়াতে, কিন্তু তাঁর পড়ানোর ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকমের। সীতানাথ ঘোষ ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তড়িৎ চিকিৎসার জন্য তিনি একটা যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তাঁর পড়ানোটা ছিল হাতে-কলমে শেখানো। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসতেন নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর সেসব দিয়ে যখন প্রমাণ করতেন বিজ্ঞানের নানা সূত্র আর তত্ত্ব তখন ব্যাপারটাতে পড়ার চেয়েও থাকত খানিকটা ম্যাজিক দেখার আনন্দ। কি হবে, এই কৌতূহল শিশু রবিকে তাই এই মাস্টারমশাই সম্পর্কে করে তুলেছিল একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহী।

একটা কাঁচের পাত্রে জলের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে তাতে তাপ দিয়ে সীতানাথবাবু যেদিন দেখালেন, তাপ দিলে নিচের জল গরম হয়ে উপরে ওঠে এবং উপরের ভারি জল নিচে নেমে আসে—তার জন্যই জল টগবগ করে ফোটে, তখন অপার বিস্ময়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষাটি দেখত রবি। এমনিভাবে রবি যেদিন জানল, দুধ জ্বাল দেবার সময় জলটা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বলে দুধ ঘন হয় তখন তার মনটাও আনন্দে ভরে উঠেছিল উথলে পড়া দুধের মতই।

সীতানাথবাবুর মতই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একজন ছাত্র আসত রবিকে অস্থিবিদ্যা শেখাতে। তার দিয়ে জোড়া লাগান একটা নরকঙ্কাল এনে সেই ছাত্রটি রবিকে শেখাত—কোন হাড় কেমন দেখতে, মেরুদণ্ডে কতগুলো হাড় থাকে এসব। সে কঙ্কাল দেখে রবির ভয়ের চেয়ে বিস্ময়টাই দেখা দিত বড় হয়ে। এরই মধ্যে হেরম্ব তর্করত্ন এসে শেখাতেন সংস্কৃত। সব মিলিয়ে সেই বয়সেই রবির জন্য শিক্ষার আয়োজনটা ছিল অনেকটা রাজসূয় যজ্ঞের মতই।

রবির 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'-এর কথা না বললে তার ছেলেবেলার গল্পটাই বাকি থেকে যায় প্রায় আধখানা। এই ভৃত্যদের হেফাজতেই একরকম মানুষ হয়েছে রবি। তাদের কাছ থেকে শিখেছেও সে কম নয়। সেই শেখাই তার কাজে লেগেছে কালে।

তখনও ঠাকুরবাড়িতে চাকরবাকরের সংখ্যাটা ছিল বেশ বলার মতই। এই চাকরদের যে বড়কর্তা, নাম তার ব্রজেশ্বর। কিন্তু মনিববাড়িতে অনেক কিছু ছাঁটাইয়ের সঙ্গে নামটাও ছোট হয়ে, হয়েছে ঈশ্বর। মনিববাড়ির এমনই মহিমা—ওই ডাকনামটাই কায়েম হয়ে গেছে তার। আর সে নামের নিচে কোথায় যে চাপা পড়েছে তার পোশাকী নাম ব্রজেশ্বর—সেটা সে নিজেও ঠাহর করতে পারত না অনেক সময়।

ঈশ্বর গাঁয়ের লোক। কিন্তু গাঁ ছাড়া সে অনেকদিন। গাঁয়ে থাকতে পাঠশালার গুরুমশাই ছিল সে। গুরুগিরিতে মান থাকলেও পেটে ভাত জুটতো না। তাই গুরুগিরিতে ইস্তফা দিয়ে সে বহাল হয়েছে বাবুদের বাড়ির কাজে।

ঈশ্বর ভৃত্য, কিন্তু তাঁর কাঁধ থেকে নামেনি গাঁয়ের পাঠশালার সেই গুরুমশাইয়ের নামাবলি। ঈশ্বর যে আর সব চাকর-বাকরের মত নয়—সেটা বোঝা যেত তার কথায়। সহজ চলতি কথ্য ভাষার মেঠো পথ ছেড়ে সে প্রায়ই হাঁটত সাধুভাষার পাথর বিছানো সড়কে। বরানগরকে সে বলত বরাহনগর, অমুক লোক বসে আছেন, না বলে বলত অপেক্ষা করছেন—এমনি সব।

তার এসব কথায় মনিবমহলে হাসির হররা উঠলেও চাকর-মহলে মিলত একটা বাড়তি সম্মান। সম্ভ্রমের চোখে তাকে দেখত সবাই।

ঈশ্বরের ঘাড়টা ছিল একটু বাঁকা—চলত বেশ দ্রুত। দুনিয়ার সব কিছুকে নস্যাৎ করার একটা ভাব ছিল তার মধ্যে। সবসময়

মুখে গাম্ভীর্যের একটা মুখোশ এঁটে ঈশ্বর যেন প্রমাণ করতে চাইত, সে আর সব ভৃত্যের মত নয়। এই জাঁকটা ছিল তার লেখাপড়া জানার জন্য।

সন্ধ্যেবেলায় রবি এবং অন্য ছেলেদের সামলাবার জন্য ঈশ্বর একটা উপায় ঠাউরেছিল। প্রথম আমলে যেটাকে বলা হত তোষাখানা—ভৃত্যমহলের সেই ঘরে চাটাইয়ের ওপর রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে রবি এবং অন্যদের বসিয়ে ঈশ্বর পড়ত রামায়ণ, মহাভারত। ঈশ্বরের এই পাঠের আসরে শ্রোতা ছিল আরো কয়েকজন ভৃত্য। তার উদ্দেশ্যটা যাই থাক, রবির কিন্তু এতে লাভই হত। সেই ছোটবেলাতেই রামায়ণ মহাভারতের অনেকখানি জানা হয়ে গিয়েছিল তার।

গুরুমশাই এবং গুরুগম্ভীর ঈশ্বরের সব ভাল, দুর্বলতা শুধু আহারের দিকে। আফিমের নেশা ছিল তার। তার জন্য চাই দুধ—একটু বেশি পরিমাণেই। তাই দুধের প্রতি তার আগ্রহটা ছিল বেশি মাত্রায়, অথচ বরাদ্দটা প্রায় নেই। ওদিকে রবি এবং তার বয়সী অন্যরা দুধটা পছন্দ করত না একদমই। বিশেষ করে সে সময় দুধ খাওয়াটা রবির মনে হত একটা বিরাট শাস্তি। তাই ঈশ্বর সামনে দুধের বাটিটা আনলেই, সে বলে উঠত, না আমি দুধ খাব না। রবির ওই না শুনে ঈশ্বর কিন্তু 'রা' কাটত না আর। ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বটা ছিল তারই ওপর। কিন্তু ঈশ্বর ভাবত, ছেলেবেলায় দুধটা না খাওয়াই ভাল। তাই ফিরে অনুরোধ করত না সে কোনদিন।

শুধু দুধ কেন, জলখাবার দেওয়ার সময়ও ঘটত প্রায় একই ঘটনা। ঈশ্বরের ঘরে শেলফওয়ালা একটা ছোট আলমারির মধ্যে কাঠের বারকোষে থাকত লুচি তরকারি।

আগে থেকে পাতায় ভাগে ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা ঈশ্বরের নিয়ম ছিল না। রবি এবং অন্যদের বসিয়ে তারপর কোনরকমে একটি করে লুচি আলগোছে পাতের ওপর দিয়ে জিজ্ঞেস করত,

আর দেব কি ?

ঈশ্বরের কড়া মেজাজ আর গোলগোল চোখের জন্য রবি তাকে একটু ভয়ই করত। তাছাড়া ঈশ্বরের লোভটাকেও বোধহয় রবি একটু করুণার চোখে দেখত। সেই করুণার পেছনে অবশ্যই ঈশ্বরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মুক্ত জীবনের স্বাদ ভোগের বাসনাও উঁকি মারত। তাই খাবার ইচ্ছে বা পেটে খিদে থাকলেও রবি নির্বিকারভাবে বলত, না, আর চাইনে আমার।

রবির এই উত্তরটাই খুশি করত ঈশ্বরকে। অন্য ছেলেরা কেন রবির মত ভাল নয়, এই নিয়ে মৃদু অনুযোগও ঈশ্বর দিত মাঝে-মাঝেই।

ছেলেদের জলখাবারের ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বর বরাদ্দমত পয়সা পেত। তাই দিয়ে বাজার থেকে নিয়ে আসত এক একরকম জলখাবার। জলখাবার আনতে যাওয়ার আগে ঈশ্বর এসে জিজ্ঞেস করত, আজ কি জলখাবার আনব ? কেউ যদি দামী কিছু আনার ফরমাশ করত তাহলেই ঈশ্বরের মেজাজটা যেত বিগড়ে।

এই ঈশ্বরের খবরদারি এড়িয়ে যেদিন থেকে ছেলেদের জন্য বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা মোড়া মাখন—সেদিন রবির মনে হল আকাশটাকেই পাওয়া গেছে হাতের নাগালে।

রবিদের বাড়ির সেই 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'-এর বড়ো কর্তা যদি ঈশ্বর বা ব্রজেশ্বর তাহলে ছোটকর্তা শ্যাম। নামে শ্যাম, রঙেও শ্যামবর্ণ এই লোকটি ছিল খুবই ভালমানুষ। যশোরে তার বাড়ি। ছেলেদের প্রতি ছিল হৃদয়ভরা দরদ। কড়া কথা বলা তার ধাতে ছিল না মোটেই।

রবিকে নানা গল্প শোনাত শ্যাম। আবার তাকে চুপচাপ এক জায়গায় বসিয়ে রাখার উপায়ও বের করেছিল সে। রবিকে বসিয়ে তার চারদিকে এক গণ্ডী কেটে দিয়ে শ্যাম বলত, খবরদার, গণ্ডির বাইরে যেও না, বিপদ হবে তাহলে।

বিপদটা যে কি তা কোনদিনই বলেনি শ্যাম। কিন্তু ঈশ্বরের

আসরে রামায়ণ শুনে শুনে রবি ততদিনে জেনে গেছে, লক্ষ্মণের কথা না শুনে গণ্ডী পার হওয়ার জন্যই বিপদে পড়তে হয়েছিল সীতাকে। তাই অবিশ্বাসীর মত কোনদিনই গণ্ডীটা পার হয়নি রবি।

ঈশ্বর যেমন রামায়ণ মহাভারত বা অন্য নানা পুরাণ থেকে গল্প বলত, শ্যাম তেমনই গল্প বলত ডাকাতের। সেকালের ডাকাতরা যে কতরকমভাবে ডাকাতি করত, ডাকাতি করলেও খুনখারাপি যে প্রায় করতই না, এমন সব গল্প। সাহসে দুর্বার এইসব ডাকাতের গল্প শুনতে শুনতে রবির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত, আবার তাদের বীরত্বপনার জন্য তাদের বেশ ভালও লাগত।

সে আমলের ডাকাতদের ডাকাতি করার নানা কায়দা দেখার সুযোগও একবার রবির এসে যায়। তাদের বাড়িতে বসেই রবি সেসব দেখে।

না, না, ডাকাতি হয়নি, হয়েছিল ডাকাতির খেলা। খেলা দেখাতে এসেছিল যারা তারা সব মস্ত কালো জোয়ান—ইয়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। তাগড়াই তেলচুকচুকে চেহারা সব।

ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিল ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ ঝুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে পাখির মত সুট করে বেরিয়ে গেল। দশ বিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাতেই ভাল মানুষের মত ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে তাও দেখাল।

শ্যামের মুখে এতদিন ধরে যেসব ডাকাতির গল্প শুনেছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ভয়ে বুকের পাঁজর চেপে রবি দেখে গেল এই নতুন খেলা। তারপর নির্জনে একা একা এইসব খেলার কথাই ভাবত সে—কল্পনায় বুঝি তৈরি করত কত নতুন নতুন খেলা।

ছোট্ট রবির ডাকাত নিয়ে এইসব ভাবনারই একটা ছবি বড়

হয়ে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বীরপুরুষ' কবিতায়। সে কবিতার নায়ক যে সেদিনের সেই শিশু রবি তাতে কোন সন্দেহই নেই।

॥ ৮ ॥

বাড়িতে থেকেও নির্বাসন—এ এক নিদারুণ যন্ত্রণা। অথচ ছোট্ট রবির জীবনের সকাল বেলাটা কেটেছে একরকম এই নির্বাসনের মধ্যেই। বাবা কাজের চাপে কাটান বাইরে বাইরে। মা ব্যস্ত অন্দরমহলে—সেখানে ছোট হলেও যখন তখন প্রবেশ নিষেধ। তাই 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' থেকে তিনি যেন পেতেন নির্বাসনের বেদনা।

তাঁর সেই নির্বাসিত জীবনে দক্ষিণের জানলা প্রথম খুলল তাঁর পৈতের সময়। পৈতের পর বাবার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ রবিকে এনে দিল মুক্ত জীবনের স্বাদ। নির্বাসনের দণ্ডটাও গেল উঠে। অন্দরমহলে এবার রবি আসনটা দখল করল বেশ ভালভাবেই।

এরই মধ্যে বাড়িতে এসে গেছেন বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী—তাঁর জ্যোতিদাদার বৌ। রবির বয়স তখন ১২। ওই বয়সে বৌঠাকুরাণীর প্রচুর স্নেহ আর আদর—রবির এতদিনের তৃষিত চিত্তকে যেন ভরিয়ে দিল। এতদিন যে কোমল ঘাস অবহেলার ইটের নিচে চাপা থেকে হয়েছিল হলুদ—তা বউঠাকুরাণীর স্নেহের জল সিঞ্চনে শুধু যে সবুজ হল তাই নয়, তা হয়ে উঠল পরিপুষ্ট।

বৌদির সঙ্গে কখনও তর্ক, কখনও খুনসুটি, কখনও খেলা, কখনও শুকনো লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খাওয়া—সব কিছুর মধ্যেই একটা অদ্ভুত আনন্দ।

রবি যে বড় কবি হবে, এটা মনে মনে জানলেও বৌদি মুখে মানতেন না কোনদিন। আর সেটাই ছিল রবির দুঃখ।

শুধু যে এই কথাটা তাই নয়, বৌদি কোন সময়েই রবির সঙ্গে একমত হতেন না—এতে মাঝে মাঝেই চটে যেত রবি। কিন্তু তর্ক করে পারত না, কেননা, বৌদি তার কথার জবাবই দিত না।

সেদিন যেমন বৌদির শখ হ'ল কাঠবেড়ালি পোষার। ছাদের ওপরে খাঁচার মধ্যে রাখা হ'ল দুটি কাঠবেড়ালি। রবি বললে, এটা অন্যায়। বৌদি বললেন, পাকামি করতে হবে না। রবি চুপ করে গেল। তারপর বৌদির আড়ালে খাঁচার দরজা দিল খুলে—কাঠবেড়ালি গেল পালিয়ে।

এমনি ঝগড়ার ফাঁকে কোনদিন হয়ত রবি বলল, আমি পারব না তোমার আমসত্ত্ব পাহারা দিতে। বৌদি বলতেন, আমার আমসত্ত্ব পাহারা না দিয়ে তোমার হাতটা সামলাও।

হার হত রবির, তাই রাগে গজগজ করত সে। সে রাগকে আরো বাড়িয়ে দিতেই বৌদি তার সবকিছুরই খুঁত ধরতেন। এমনকি তাকে দেখতেও যে ভাল নয়—একথা বলে তাকে চটিয়ে লাল করে দিতেন। বৌদি শুধু তারিফ করত তার সুপুরি কাটার। আর ওই তারিফেই রবি সুপুরি কাটত সরু সরু করে।

এমনিভাবে রবির জীবনের সকালটা চলে গড়িয়ে গড়িয়ে। রোদ্দুর বাড়তে থাকে একটু একটু করে। তারপর হঠাৎই একদিন রবি দেখে কোথায় সকাল—বেলা যে হ'ল ঢের।

খেলায় পড়ায়, আদর উপেক্ষায়, সুখে দুঃখে করেই যে সকালটা গিয়েছে চলে তা খেয়াল করেনি রবি নিজেই।

বর্ণালী সেই সকালটা যখন পেঁছুল দুপুরে—তখন রবি আর রবি নয়—রবি তখন রবীন্দ্রনাথ। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যের মতই বাংলার সাহিত্যগগনে তখন তাঁর স্থান। শুধু বা বাংলাই কেন—বাংলার কবি তখন সারা বিশ্বের। তখন তিনি বিশ্বকবি। তাইতো যখন তাঁর ৫৩ বছর বয়স সেই সময় সেই ১৯১৩ সালে তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে ধন্য হ'ল বিশ্ব। তারই মধ্য দিয়ে অবনত হ'ল পরাধীন ভারতের পায়। রবি জীবনের সেই দুপুরবেলার কথা এখন আর নয়। এখন শুধু সকালের আলোয় রাঙিয়ে নেওয়ার পালা।

———